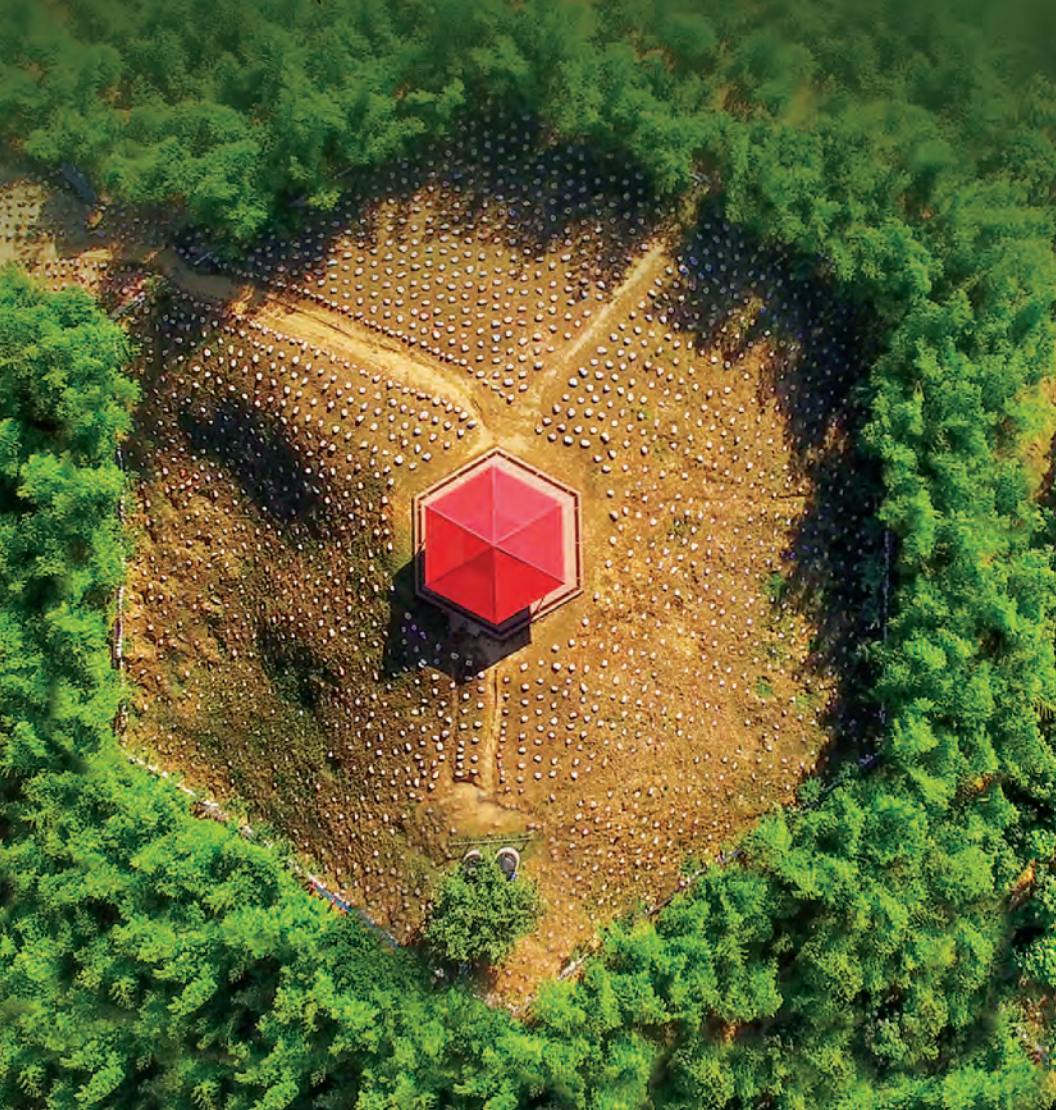


কর্মব্যস্ত সুখী জীবন



ভোগবাদী পণ্য-আগ্রাসন আর নিত্যনতুন
প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে আজ
বিশ্বজুড়ে বাড়ছে লক্ষ্যহীন, নিষ্ক্রিয়, হতাশ,
একাকী ও পরিবার-বিচ্ছিন্ন মানুষের সংখ্যা।
সেইসাথে ফেসবুক-ইউটিউব-অনলাইন গেমের
মতো ভার্চুয়াল ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে তারা
ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে আত্মত্বংসী গোলকধাঁসায়।
ডুবে যাচ্ছে বিভ্রান্তির চোরাবালিতে।

বৈশ্বিক এ সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে
মূলধারার পত্রিকা ও খ্যাতনামা চিকিৎসা-
সাময়িকীগুলো বলছে—লক্ষ্য-সচেতনতা,
ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি, পারিবারিক সম্প্রীতি
ও সক্রিয় জীবনচারাই পারে দুর্দশার এই বৃত্ত
থেকে একজন মানুষকে মুক্তি দিতে।

সে বিবেচনায় আমরা বলতে পারি—
কোয়ান্টামের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে
প্রকাশিত *কর্মব্যস্ত সুখী জীবন* একটি
সময়োপযোগী সংকলন। যার ৩২টি
নিবন্ধজুড়ে রয়েছে জীবনকে কর্মমগ্নতায়
উদ্যাপন করার কল্যাণ-আহ্বান।
বিষয়বৈচিত্র্যে তাই বইটি হয়ে উঠতে
পারে আধুনিক মানুষের যুগ-যন্ত্রণার
অন্যতম প্রতিষেধক।

কর্মব্যস্ত সুখী জীবন



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

সংকলন ও সম্পাদনা

ডা. আতাউর রহমান

কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

সংকলন ও সম্পাদনা

ডা. আতাউর রহমান

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/তি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক,

শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৯৩৫৫৭৫৬, ০৯৬১৩-০০২০২৫

০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮

E-mail : info@quantummethod.org.bd

গ্রন্থস্বত্ব

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

প্রথম প্রকাশ

অমর একুশে গ্রন্থমেলা

ফেব্রুয়ারি ২০১৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মাসুম রহমান

মুদ্রাকর

উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার

ইসলাম ভবন (২য় তলা)

৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য

২০০ টাকা

Kormobyasto Shukhi Jibon

(Active Life Happy Life)

Published by

Quantum Foundation

quantummethod.org.bd

Price : \$15

উৎসর্গ

বাংলাদেশে শিশু চিকিৎসার পথিকৃৎ ও শিশুবন্ধু
জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান
বয়স ৮০ পেরিয়েও যিনি ছিলেন
কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের
অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত

কর্মব্যস্ততাই সুখ

নিরন্তর কর্মব্যস্ততার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত সুখ। প্রাচীন যুগের সাধক কিংবা এ-কালের বিজ্ঞানী-গবেষক-মনোবিদ, সবার অনুসন্ধান-অভিজ্ঞতাতেই এ কথাটি পেয়েছে চিরায়ত সত্যের মর্যাদা।

কোয়ান্টাম গত সিকি শতাব্দী ধরে যে বিশ্বাসে ভর করে ক্রমবিকশিত হয়েছে, অব্যাহত রেখেছে অদম্য সাফল্যযাত্রা, তারও অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে সুপরিকল্পিত কর্মব্যস্ততা। শুরু থেকেই কোয়ান্টাম বলেছে—সুস্থ সুখী সার্থক জীবনের জন্যে মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনাচার অনুসরণের পাশাপাশি কাজে ব্যস্ত থাকুন। নিজের ও সমাজের জন্যে যত বেশি সময় কল্যাণকর কাজে ব্যস্ত থাকবেন, আপনি তত ভালো থাকবেন। ইতিবাচকতা ও আশাবাদে হবেন উজ্জীবিত, নেতিবাচকতার আক্রমণ থেকেও থাকবেন নিরাপদ। ভালো থাকবে আপনার শরীর-মন, আপনার পরিবার।

এ কর্মপ্রাণ চেতনায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে কোয়ান্টাম বুলেটিনে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্ত সমৃদ্ধ একাধিক নিবন্ধ। তারই নির্বাচিত কিছু নিবন্ধের সংকলন *কর্মব্যস্ত সুখী জীবন*, যেখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে স্বাস্থ্য, পরিবার, লক্ষ্য সংক্রান্ত কথামালা।

২০১৪ সালে প্রকাশিত এ সিরিজের প্রথম বই *সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন* লাভ করেছে অনন্য পাঠকপ্রিয়তা। আমরা বিশ্বাস করি, *কর্মব্যস্ত সুখী জীবন* বইটিও সর্বস্তরের পাঠকের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হবে।

প্রিয় পাঠক, আপনাদের সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন কামনা করি।

সূচিপত্র

১৩.

কর্মব্যস্ত সুখী জীবন ॥ যত ব্যস্ত তত সুস্থ

১৮.

পরার্থে স্বেচ্ছাশ্রম

সুস্থ জীবনের অব্যর্থ দাওয়াই

২৩.

নতুন রোগ : পণ্যাসক্তি!

২৭.

নিয়মিত রাত্রি জাগরণে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে

৩০.

বেশি কথা মোবাইলে কান যাবে অকালে

৩৪.

ফেসবুক আসক্তি মাদকাসক্তির মতোই ভয়ংকর

৩৮.

ডিজিটাল অ্যামনেশিয়া ॥ সচেতনতার বিকল্প নেই

৪১.

পেইনকিলারে ব্যথা নয় ক্ষয় হয় প্রাণ!

৪৫.

দেশে মেদস্থূলতার হার বাড়ছে!

সচেতন হোন এখনই

৪৯.

খুনি চেয়ারকে 'না' বলুন

সুস্থতার জন্যে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকুন

৫২.

মিথ্যা তথ্যে প্রাণ যাচ্ছে মানুষের

মুনাফা বাড়ছে ওষুধ কোম্পানির

৫৬.

ধূমপান ছাড়তে পারেন আপনিও

৬৩.

সঠিক জীবনদৃষ্টি ও যত্নায়ন

দেহ-মনকে স্ট্রেস ও টক্সিনমুক্ত করে

৬৮.

পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন

আপনাকে রাখবে সুস্থ প্রাণবন্ত কর্মোদ্যমী

৭৩.

পরিবারে সালামের চর্চা বাড়াবে শান্তি সুখ সমর্মিতা

৭৬.

মায়ের ভুল খাদ্যাভ্যাসে বাড়ে গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্যঝুঁকি

৭৯.

নৈতিক শিক্ষা আপনার সন্তানকে করবে
সততা ও দৃঢ়তায় আত্মনির্ভরশীল

৮৩.

সন্তানরা নীরবে অনুসরণ করছে আমাদের

৮৬.

পরিবারকে সুখী করার দায়িত্ব আমার

৯৫.

কাউকে না কাউকে তো গুরু করতে হবে

১০০.

সুস্পষ্ট লক্ষ্যই আনে কাজিফত সাফল্য

১০৪.

সহযোগিতা সবার সাথে
প্রতিযোগিতা নিজের সাথে

১১০.

আনন্দময় কর্মব্যস্ততা বিষণ্ণতা রোধ করে

১১৩.

আজকের সঞ্চয়
আপনার আগামী দিনের শক্তি

১১৮.

চাই আশা
আশাই জীবনের মূল চালিকাশক্তি

১২২.

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য জীবনকে সুখী করে
সুস্থ রাখে শরীর-মন

১২৯.

প্রশান্তি ও দীর্ঘজীবনের জন্যে
মেডিটেশন করুন, ইতিবাচক হোন

১৩৫.

নিয়মিত প্রাণায়াম করুন, আপনি সুস্থ থাকবেন

১৩৮.

মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও মনের শক্তিকে সুতীক্ষ্ণ করে মেডিটেশন

১৪৩.

মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনাচার
বিষণ্ণতা প্রতিরোধ ও নিরাময় করে

১৪৮.

নিয়মিত মৌনতা চর্চায় আপনি হবেন প্রশান্ত উদ্যমী সৃজনশীল

১৫৩.

নবজাগরণে জনপ্রিয় হচ্ছে যোগ-মেডিটেশন

କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ
ସୁଖୀ ଜୀବନ

কর্মব্যস্ত
সুখী জীবন
যত ব্যস্ত তত সুস্থ



“ডেল কার্নেগির বইতে পড়েছিলাম গল্পটা। একটি দুর্ঘটনায় এক পিতা তার ছেলেকে হারান। ভদ্রলোক কিছুতেই এই নিদারুণ মৃত্যুশোক সহ্য করতে পারছিলেন না। খাওয়া ঘুম কাজকর্ম সব প্রায় বন্ধ। মর্মান্তিক যন্ত্রণায় দিন কাটছিল তার। এ কষ্টের ভার বহন করা তার পক্ষে কিছুতেই আর সম্ভব হচ্ছিল না। শরীর-মন পুরো ভেঙে গিয়েছিল।

এমন দুঃসহ সময়ে একদিন তার ছোট্ট মেয়েটি আবদার করে বসল— বাবা, আমাকে একটা নৌকা বানিয়ে দেবে? মেয়েকে খুশি করতে তিনি একটানা কয়েক ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমে কাঠ দিয়ে একটা নৌকা বানালেন। নৌকাটি মেয়ের হাতে তুলে দিতে গিয়েই তার মনে হলো, ছেলে মারা যাওয়ার পর নৌকা বানানোর এই কয়েকটি ঘণ্টাই তিনি পুত্রশোকের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত ছিলেন।

কেন তিনি এ সময়টা পুত্রশোকের দুঃখ অনুভব করলেন না? কারণ খুঁজতে গিয়ে টের পেলেন ছেলের মৃত্যুর পর এই প্রথম তিনি ছেলেকে নিয়ে কিছু ভাবার সময় পান নি। তখন তিনি বুঝলেন, কাজ জিনিসটা এমনই। কোনো কাজ করার সময় কারো পক্ষে অন্য কিছু ভাবা সম্ভব নয়। নৌকা তৈরির সময় তিনি ছিলেন ঐ কাজটার মধ্যে পুরোপুরি ডুবে যাওয়া মানুষ। তাই সন্তান হারানোর শোকও তার তখন অনুভূত হয় নি। ব্যস, তিনি যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ পেয়ে গেলেন।

এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন—একের পর এক কাজ করে যাবেন। যতক্ষণ কাজ ততক্ষণই শান্তি। তিনি মন দিয়ে কাজ করতে লাগলেন। করতে করতে ঠিকই একসময় পুত্রশোক কাটিয়ে উঠলেন।

কাজ এভাবেই মানুষকে বাঁচায়। কাজ দিয়েই আমরা দুঃখকে অতিক্রম করি, দুর্ভাগ্যকে জয় করি। যে যত বেশি কাজ করে সে তত হতাশামুক্ত, দুঃখ-যন্ত্রণাহীন ও আনন্দপূর্ণ। প্রতিটা কাজই জীবনে কমবেশি সাফল্য নিয়ে আসে। সাফল্য মানেই আনন্দ। তাই কাজ মানেও আনন্দ। একজন মানুষ যত কাজ করবে তত তার জীবনে আনন্দ বাড়বে।”

কাজ, বিশ্বাস ও ইতিবাচকতা শীর্ষক একটি অনবদ্য বক্তৃতায় কথাগুলো বলেছিলেন শিক্ষাবিদ ও ‘আলোকিত মানুষ চাই’ আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

চলুন শুন, দেহ-মন-দীর্ঘায়ুর ওপর কর্মব্যস্ততার প্রভাব নিয়ে এ-কালের চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্যগবেষকরা কী বলছেন—

কর্মব্যস্ত জীবন মানে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু

প্রাচীন প্রবাদ মতে, কাজ করতে করতে মানুষ বড়জোর ক্লান্ত হয়, কিন্তু কাজ না করতে করতে সে হয়ে পড়ে হতাশ ও বিষণ্ণ। হাল আমলের বিজ্ঞানীরা বলছেন, কর্মব্যস্ততাহীন অলস মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকিও তুলনামূলক বেশি। আর দৈনন্দিন রুটিন অনুসারে কর্মব্যস্ত সময় পার করেন যারা, তারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ জীবনযাপন করেন। বাড়ে তাদের দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা।

তারা বলছেন, আনন্দময় কর্মব্যস্ততা শরীর-মন দুয়ের জন্যেই স্বস্তিদায়ী ও স্বাস্থ্যকর। ফলপ্রসূ ব্যস্ততা দেহ-মনকে রাখে সুস্থ ও প্রাণোচ্ছল। দূর হয় মনের মেঘ। যাবতীয় আলস্য ও নেতিচিন্তা-হতাশা-বিষণ্ণতাকে বিদায় করে ঝেঁটিয়ে। জীবন হয়ে ওঠে সুখী ও সার্থক।

এর পাশাপাশি যে-কোনো সমস্যা মোকাবেলায় মনোদৈহিক দিক থেকে তারা হন অধিকতর সক্ষম। গবেষণায় দেখা গেছে, ক্রমাগত নানারকম কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে ওঠে বাস্তববাদী। বুদ্ধিমত্তা হয়ে ওঠে সুতীক্ষ্ণ। স্মৃতিশক্তি থাকে অটুট। ফলে বয়সজনিত স্মৃতিভ্রষ্টতায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা তাদের তুলনামূলক কম।

ব্যস্ততায় সুখনিদ্রা ও প্রখর মস্তিষ্ক

আমেরিকায় পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণা প্রতিবেদন অনুসারে, লক্ষ্যপানে ব্যস্ত মানুষেরা সুনিদ্রা উপভোগ করেন। ঘুম থেকে তারা ভোরে জাগতেও পারেন কোনো জড়তা ছাড়াই। তাদের সামনে কারণটা স্পষ্ট থাকে যে, কেন তারা ভোরে জাগবেন। সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার কারণেই তাদের জন্যে এটা বেশ সহজ।

যুক্তরাষ্ট্রের নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিদদের মতে, কর্মব্যস্ত দিন কাটান যারা, তারা অনিদ্রা ও ঘুম-সংক্রান্ত জটিলতায় ভোগেন কম। *স্লিপ সায়েন্স* জার্নালে প্রকাশিত এ গবেষণাটি মূলত যাদের ওপর চালানো হয় তাদের গড় বয়স ছিল ৭৯। তবে গবেষণায় নেতৃত্বদানকারী প্রফেসর জেসন অং বলেন, যে-কোনো বয়সী মানুষের ক্ষেত্রেই এটা সত্য।

ব্যস্ত দিনের শেষে ঘুম ভালো হয় বলে তাদের মনও থাকে সতেজ। থাকতে পারেন উদ্যমী। *ফ্রন্টিয়ার্স ইন নিউরোসায়েন্স* জার্নালের একটি

রিপোর্টে গবেষক সারা ফেসিনি বলেন, হরেক প্রকার কাজ আর চ্যালেঞ্জের পথ ধরে মস্তিষ্কে ঘটে নিউরোপ্লাস্টিসিটি বা নিউরোনের সংযোগায়ন। মস্তিষ্ক হয়ে ওঠে প্রখর। নিত্যনতুন দক্ষতার বিকাশ ঘটে সহজেই।

আলস্যে দুর্গতি, ব্যস্ততায় সুখ

কাজে ফুরসত পাই না বলে আমরা যে কখনো-সখনো হা-হুতাশে ভুগি না তা নয়; কিন্তু জেনে রাখুন, আজকের গতিময় পৃথিবীতে ব্যস্ত মানুষের কদর বেশি। আপনি ব্যস্ত, অতএব আপনি একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। অন্যদিকে অলস মানুষের সময় কাটে অনর্থক গালগল্প আর ঠুনকো বিনোদনে। জীবনে যা কেবল দুর্গতিই বাড়ায়।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহেভিয়ারাল সায়েন্সের প্রফেসর ও সাইকোলজিস্ট ক্রিস্টোফার হ্যাসি। ২০১০-এ প্রকাশিত *ফিজিওলজিক্যাল সায়েন্স* জার্নালে তিনি লিখেছেন, ব্যস্ততার সময়টাই আদতে আমাদের সুখের সময়। সে বিচারে অলস লোকের অবস্থা বড় শোচনীয়। সুখী হওয়ার জন্যে তাদের প্রতি একটাই আহ্বান-কর্মব্যস্ত থাকুন।

কর্মমগ্ন লোকেরা নিশ্চিতভাবেই আত্মবিশ্বাসী। আরামবলয় ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারেন তারা। বাড়ে তাদের কর্মপরিধি। বিষয়টি মাথায় রেখেই অভিভাবকদের প্রতি গবেষকদের পরামর্শ-শৈশব থেকেই সন্তানদের গড়ে তুলুন কর্মব্যস্ত মানুষ হিসেবে। আত্মবিশ্বাসদৃষ্ট একজন মানুষের মতোই সে থাকবে হতাশা ও নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত।

অবসরযাপন নয়,

ব্যস্ত থাকুন সেবায় ও কল্যাণে

দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে বা পেশাগত জীবন শেষে নিছক অলস অবসরযাপন নয়, বরং যতটা সম্ভব কর্মব্যস্ত থাকুন। আনন্দ খুঁজে নিন সেবায়। ব্যস্ত থাকুন সৃষ্টির কল্যাণে। মনোদৈহিক সুস্থতার জন্যেই জরুরি এই কর্মসম্পৃক্ততা। ২০১৬-তে যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, অবসর গ্রহণের পর একবছরের কর্মসম্পৃক্ততাও অকালমৃত্যুর হার কমাতে পারে শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত!

এ প্রসঙ্গে ইতালির ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের নিউরোসায়েন্টিস্টরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন-পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তিদের মধ্যে যারা অবসরজীবন যাপন করছেন, তাদের পেশির স্বাভাবিক শক্তি ও কার্যক্ষমতা হারানোর ঝুঁকি

তুলনামূলক বেশি, যা পরবর্তীতে জটিল রোগের সম্ভাবনা বাড়ায়। *হেলথ ইকোনমিকস* জার্নালে প্রকাশিত এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে ইউরোপের ১২টি দেশে অবসর-যাপনরত ৫০ ও তদূর্ধ্ব বয়সী মানুষের ওপর।

মানবকল্যাণে ব্যস্ততা অবসর-জীবনে আপনাকে রাখবে সুস্থ ও প্রাণবন্ত। রীতিমতো বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত এটি। ৬৫ বছর বয়সে অবসরে গেছেন এমন ১০০১ জন সুইডিশ নাগরিককে দুবছর পর্যবেক্ষণ করেন কানাডার ক্যালগেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজিস্ট প্রফেসর ইয়ানিক গ্রিপ। তিনি বলেন, এদের মধ্যে যারা সপ্তাহে অন্তত একদিন সেবামূলক কাজে ব্যস্ত ছিলেন, অন্যদের তুলনায় তাদের বয়সজনিত স্মৃতিভ্রষ্টতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমেছে প্রায় আড়াই গুণ।

প্রফেসর গ্রিপের মতে, প্রবীণদের কর্মসম্পৃক্ততা বিশেষত সেবামূলক কাজে ব্যস্ততা তাদের সুস্থতার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে তারা উদ্যমী থাকেন। এতে মস্তিষ্ক যেমন থাকে সক্রিয়, তেমনি চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডেও তারা থাকেন সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজিস্ট ড. জেন প্রিন্স বলেন, কর্মব্যস্ততায় কমে তাদের ব্যথা ও যন্ত্রণার অনুভূতি।

যত ব্যস্ত তত সুস্থ

যত আরাম তত ব্যারাম

জ্ঞানীরা বলেন, আলস্যই জীবনের প্রথম শত্রু। আর কর্মব্যস্ততা মানে জীবনের উদযাপন। সুস্থতা, সুখ ও সাফল্য ধরা দেয় কর্মপ্রাণ মানুষের ভাগ্যেই। উদ্যমী হয়ে কাজে নেমে পড়লেই লেজ গুটিয়ে পালায় যত ভয়, শঙ্কা আর বিষণ্ণতা। বহুমুখী কাজের মধ্য দিয়ে তখন প্রকৃতই খুঁজে পাওয়া যায় মানবজীবনের অর্থ ও সার্থকতা। অন্যদিকে আরামে বাড়ে শত ব্যারাম। এটাই সত্য।

তাই যথাসাধ্য ব্যস্ত থাকুন—ইতিবাচক ফলপ্রসূ কাজে আর সজ্জবদ্ধ সেবায়। নিয়মিত মেডিটেশন, সুস্থ জীবনাচার ও সুপরিচালিত দৈনন্দিন রুটিন হোক আপনার কর্মব্যস্ত জীবনের অনুপ্রেরণা। থাকুন সুস্থ। জীবন হোক সুখ ও সার্থকতায় পূর্ণ।

তথ্যসূত্র : ডেইলি মেইল ও ওয়াশিংটন পোস্ট, ২২ আগস্ট ২০১৭



পরার্থে
স্বেচ্ছাশ্রম
সুস্থ জীবনের
অব্যর্থ দাওয়াই



মাধ্যমিকে পড়ুয়া এক স্কুলছাত্র।

কী একটা উপলক্ষে ওদের ক্লাসে একদিন বেশ খাওয়াদাওয়া হলো। সবারই পানির তেষ্টা পেয়েছে। তাই কয়েকটা গ্লাস জোগাড় করে দপ্তরিকে বলা হলো টিউবওয়েল থেকে জগভর্তি করে পানি এনে দিতে। ক্লাস-ক্যাপ্টেন সেই ছেলেটি নিল সবাইকে পানি পান করানোর দায়িত্ব।

দপ্তরি জগভর্তি করে পানি এনে দিচ্ছে, ছেলেটি জগ হাতে সহপাঠীদের কাছে গিয়ে গ্লাসে পানি ঢেলে দিচ্ছে। সবার খাওয়া শেষ হলে ছেলেটি গিয়ে বসে পড়ল তার বেষ্টিতে।

আপাতদৃষ্টিতে ঘটনা অতি সামান্যই। কিন্তু একটু পরেই হঠাৎ যে অপার্থিব শিহরণ ছেলেটি অনুভব করল, সেটি তার জীবনে এই প্রথম। জীবনে এই প্রথমবারের মতো সে উপলব্ধি করল-চাইলে সে-ও অন্যের জন্যে কিছু করতে পারে! ক্লাসে প্রথম হয়ে কিংবা ক্লাস-ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় সবার স্নেহ ও সমীহ জোটে বটে, কিন্তু তার চেয়েও এক অলৌকিক আনন্দ আর সুখ মেলে পরার্থে কিছু করতে পারায়। এই সুখানুভূতির তোড়ে নিজের ছোটখাটো খেদ-দুঃখ রাগ-অভিমান কোথায় যে মিলিয়ে যায়!

সবচেয়ে বড় কথা, ছেলেটি সেদিন বুঝতে পেরেছিল-জগতে তারও একটা ভূমিকা আছে, তারও কিছু দেয়ার আছে পৃথিবীকে।

প্রিয় পাঠক, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো বলে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে। কথাটা সাধারণত বলা হয়ে থাকে তচ্ছিল্য অর্থে, কিন্তু সেই দিন বুঝি এবার ফুরাল!

সাম্প্রতিককালের চিকিৎসাবিজ্ঞানী-মনোবিদদের চমকপ্রদ গবেষণা-প্রতিবেদনগুলো বলছে, ঘরের খেয়ে সত্যিই যারা বনের মোষ তাড়াতে পারেন অর্থাৎ কোনোরকম প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই চারপাশের মানুষ ও সমাজের কল্যাণে নিয়মিত কাজ করে যান, তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা বাড়ে। কমে হতাশা-বিষণ্ণতা-একাকিত্বের অনুভূতি। তাদের পেশাজীবনেও সৃষ্টি হয় অনবদ্য সাফল্য-সম্ভাবনা।

এ প্রেক্ষিতে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ-এখন থেকে চিকিৎসকদের উচিত সুস্থতার জন্যে রোগীদের সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামের পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণে কাজ করার পরামর্শ দেয়া।

সেবাকর্মে বাড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে স্ট্রেস, রক্তচাপ থাকে নিয়ন্ত্রণে

পেশাগত দায়িত্ব বা কোনো ব্যাপারে কি উদ্বিগ্ন সময় পার করছেন? স্ট্রেস কি ব্যাঘাত ঘটাবে আপনার দৈনন্দিন জীবনে? নাকি বিষণ্ণতার আক্রমণে আপনি পর্যুদস্ত? ভয় নেই। আছে মোক্ষম সমাধান।

বাসে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন, আপনার পাশেই কি দাঁড়িয়ে আছেন গর্ভধারী নারী বা বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ? আপনার আসনটা তার জন্যে ছেড়ে দিন। অধস্তন ব্যক্তিটি নিত্যদিন আপনাকে আগে সালাম দেন, আজ কি উল্টোটা হতে পারে না?

দিনশেষে ভেতরে সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন আপনি নিজেই টের পাবেন। এই যে অন্যের তরে সাধ্যমতো কিছু করলেন, একটুখানি দিলেন, ওই ‘দেয়া’টুকুতেই সুখ, তাতেই জীবনের পূর্ণতা। কারণ একটু একটু করেই মানুষ একসময় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে বড় কিছু দিতে। সজ্জবদ্ধ প্রচেষ্টায় সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় একটা ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে।

সাইকোলজি টুডে সাময়িকীর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্যের কল্যাণে কাজ করে যে নির্মল সুখানুভূতি আমরা পাই, তাতে সেরোটোনি-এন্ডোরফিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটার ও হরমোনের প্রবাহ বাড়ে, যা বিষণ্ণতা-দুশ্চিন্তার মতো নেতিবাচক আবেগের ঝুঁকি কমায়। সেইসাথে বাড়ায় রোগ প্রতিরোধ শক্তি। সংহত হয় আবেগীয় ভারসাম্য। দেহ-মনকে করে চনমনে ও গতিময়।

উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ স্ট্রেস। আর মানবকল্যাণে কাজ স্ট্রেস কমায় বলে এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্রের কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত এক গবেষণায় এর সত্যতা মিলেছে। তাতে দেখা গেছে, বছরে অন্তত দুশ ঘণ্টা স্বেচ্ছাশ্রমে ব্যয় করেছেন এমন স্বেচ্ছাসেবীদের রক্তচাপ আগের তুলনায় কমেছে। এতে নেতৃত্বদানকারী গবেষক রোডলশিয়া স্নিড বলেন, এসব তথ্য-উপাত্ত প্রকাশের পর শুধু রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যেই এখন অনেকে সেবামূলক কাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

স্বেচ্ছাশ্রমে যে কেবল বয়স্করাই উপকৃত হচ্ছেন তা নয়। কানাডায় ১৬০ জন শিক্ষার্থীর ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার পর তাদের কোলেস্টেরলের মাত্রা ও অতিরিক্ত ওজন হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে।

স্মৃতিভ্রষ্টতা ও স্নায়বিক-মানসিক জটিলতার কার্যকর ওষুধ

গত কয়েক দশকে বার্ষিক্যজনিত স্মৃতিভ্রষ্টতা বা আলঝেইমার্স রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে সারা পৃথিবীজুড়েই। এটি প্রতিরোধের জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনধারা গুরুত্বপূর্ণ বটে, তার পাশাপাশি সেবামূলক কাজে সময় দেয়ার মাধ্যমেও আপনি এ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকদেরই পরামর্শ এটি।

বার্ষিক্যবিষয়ক চিকিৎসা-সাময়িকী *জার্নাল অব জেরোন্টোলজি*-তে বলা হয়েছে, সেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকলে মানবমস্তিষ্কের স্থিতিস্থাপকতায় ঘটে ইতিবাচক পরিবর্তন। আন্তঃনিউরোন সংযোগ বাড়ে মস্তিষ্কে। ফলে কমে আলঝেইমার্সের ঝুঁকি। ৬৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের ক্ষেত্রে এভাবেই বার্ষিক্যজনিত স্মৃতিভ্রষ্টতা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

আছে আরো চমকপ্রদ তথ্য। সেবাপ্রদেয় নিবেদিত একদল বয়োবৃদ্ধ নান-এর মৃত্যুর পর তাদের মস্তিষ্ক সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে গবেষকরা দেখেন, এক-তৃতীয়াংশের মস্তিষ্কই ছিল আলঝেইমার্সের উপসর্গ-আক্রান্ত। কিন্তু মজার ব্যাপার, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দৈনন্দিন কাজকর্ম যেমন : শিশুদের পড়ানো, জটিল ধাঁধা সমাধান এমনকি গাড়ি চালিয়ে রোগীদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা-নেয়ার কাজেও ওরা ছিলেন দারুণ স্বচ্ছন্দ।

এর কার্যকারণ ব্যাখ্যায় গবেষকরা বলছেন, মস্তিষ্ক মানবদেহের এমন একটি বিস্ময়কর অঙ্গ-যার কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত বা অকেজো হলেও সে ঠিকই তার অক্ষত অংশটুকু দিয়ে কোনোভাবে কাজ চালিয়ে নিতে সক্ষম-যদি তার সামনে থাকে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ ও কর্মপরিকল্পনা।

আর এ ধরনের কাজের সুবাদে পরিচিতির গণ্ডিটা বড় হয় বলে গড়ে ওঠে একটা সত্যিকারের সামাজিক যোগাযোগ এবং নতুন নতুন সম্পর্কের উষ্ণতায় মানুষ ক্রমান্বয়ে মুক্তি পায় পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডারের মতো (অতীতের তিক্ত স্মৃতি বা দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট) বিভিন্ন মনোদৈহিক ও স্নায়বিক জটিলতা থেকে।

সেবায় তৃপ্তি ও সাফল্য পরার্থপরতায় সুখ

২০১২ সালে যুক্তরাজ্যের ‘রয়াল ভলান্টারি সার্ভিস’ পরিচালিত গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, সঙ্ঘবদ্ধ সেবাকার্যে উৎসাহী মানুষেরা পরিণত বয়সে

বিষণ্ণতা ও সামাজিক একাকিত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকেন। তুলনামূলকভাবে এরা হন তৃপ্ত ও প্রশান্ত। সেবাব্রতী মানুষদের জীবনমানেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ করেছেন গবেষকরা।

সামাজিক কল্যাণে বিভিন্ন সেবা-কার্যক্রমে যারা সময় ও শ্রম দেন, তারা হন অধিকতর আত্মবিশ্বাসী ও মানসিকভাবে সক্ষম। নানা কাজের অভিজ্ঞতায় উদ্ভূত পরিস্থিতিগুলোও তারা সামলে নিতে শেখেন দ্রুততর দক্ষতায়। গবেষকরা বলছেন, এটি পেশাগত সমৃদ্ধিতেও রাখতে পারে দারুণ ভূমিকা।

শৈশবে এমন কাজের সুযোগ-পরিবেশ ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে উচ্চতর মূল্যবোধ গড়ে দেয়। এ কারণেই বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বেচ্ছাসেবার অভিজ্ঞতা আছে এমন শিক্ষার্থীদের বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

তাই আসুন, সাধ্যমতো আমরাও নিবেদিত হই সৃষ্টির সেবায়, মানুষের কল্যাণে। পরার্থপরতার মধ্য দিয়েই খুঁজে নিই জীবনের সার্থকতা। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সেবা-উদ্যোগগুলো আরো গতিশীল হয়ে উঠুক আমাদের আন্তরিক শ্রম, সময় ও অর্থে। আমাদের সজ্জবদ্ধ সেবা-প্রচেষ্টায় আলোকিত হোক লক্ষ দুস্থ-বঞ্চিতের জীবন।

তথ্যসূত্র : হার্ভার্ড হেলথ ব্লগ, জার্নাল অব মেডিকেল এসোসিয়েশন পেডিয়াট্রিকস,
দ্য আটলান্টিক ও হাফিংটন পোস্ট



নতুন রোগ
পণ্যাসক্তি!



বিজ্ঞানের তাক-লাগানো অগ্রগতি পাল্টে দিয়েছে আধুনিক মানুষের জীবন। সমূলে বদলে গেছে জীবনযাপনের ধরন। স্যাটেলাইট চ্যানেল, ই-মেইল, ফেসবুক-টুইটারসহ বহুরকম অ্যাপস ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে আজকের মানুষ। প্রতিমুহূর্তে তাকে সামলাতে হচ্ছে অগণন তথ্যের অবিরাম স্রোত। এমন ঠাসবুনোটের ভিড় এড়িয়ে সে ঘরে ফেরে নিরিবিলিতে একটু দম ফেলার আশায়। কিন্তু সে ঘর যদি হয় পণ্যবোঝাই, তা কি পারে তার জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে? দিতে পারে কি একটু শান্তি? পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরা নেমে পড়েছেন সে উত্তর খুঁজতে।

পৃথিবীতে ভোগ্যপণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বজুড়ে ব্যবসায়ীরা প্রতিনিয়ত আকর্ষণীয় আর নিত্যনতুন সব পণ্যের বিজ্ঞাপন নিয়ে মার্কিনীদের দুয়ারে হাজির হচ্ছে। প্রয়োজন থাকুক বা না-ই থাকুক, তারা কিনছেও দেনারসে। ক্রমশ ভরিয়ে তুলছে ঘরবাড়ি। খালি নেই বাড়ির বেজমেন্ট গ্যারেজ বারান্দা উঠান কোনোকিছুই।

মনোবিজ্ঞানীরা মার্কিনীদের পণ্য কেনার এই অস্বাভাবিক বিকারগ্রস্ততার নাম দিয়েছেন ‘হাইপারঅ্যাকুইজিশন’। এ নিয়ে এক দশকের দীর্ঘ গবেষণার পর গবেষকরা তাদের মতামত জানিয়েছেন। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া লস অ্যাঞ্জেলেসের নৃবিজ্ঞানী ইলিনর ওকস-এর মতে, অতিরিক্ত পণ্য কেনা ও সংগ্রহের প্রবণতা মানুষকে শান্তি দেয় না, বরং তা একসময় হয়ে দাঁড়ায় দুশ্চিন্তা ও অবসাদের কারণ।

কেনই-বা মার্কিনীদের এই পণ্যপ্রীতি? নেপথ্যের ইতিহাসটা চমকপ্রদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মেলবন্ধন। আগের যে-কোনো সময়ের তুলনায় পণ্য হয়ে পড়ে সহজলভ্য এবং সস্তা। সেই থেকে শুরু মার্কিনীদের পণ্যপ্রীতি। একপর্যায়ে যা প্রভাবিত করে তাদের সামাজিক মূল্যবোধকেও। শুধু ক্রয়ক্ষমতাই একজন মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করতে পারে, এ ধারণা গোঁথে যায় মার্কিন সমাজের মর্মমূলে।

ব্যবসায়ীরা দেখল, এ-তো দারুণ সুযোগ! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সে-দেশের শীর্ষ মোটরগাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান জেনারেল মোটরস প্রতি বছর

নতুন নতুন মডেলের গাড়ি বাজারজাত করতে শুরু করল। নিয়মিত গাড়ির মডেল বদলানো তখন আর প্রয়োজনের তাগিদে নয়, বরং রূপ নিল স্ট্যাটাস সিম্বলে। না পারলে ঋণ করে হলেও কেনো, তবু কেনো। এভাবেই ধীরে ধীরে মার্কিনীদের মাঝে চালু হয়ে গেল ঋণ করে হলেও হালফ্যাশনের পণ্য কেনার অসুস্থ অভ্যাস ও প্রতিযোগিতা।

আর তারই পথ ধরে আশির দশকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ক্রেডিট কার্ড। আবির্ভাব ঘটে বড় বড় সুপারস্টোরের। বিক্রি বাড়তে ব্যবসায়ীরাও বেছে নেয় নানান রকম কৌশল। যেমন : বিভিন্ন উপলক্ষে আকর্ষণীয় মূল্যছাড়, অনলাইনে কেনার সুযোগ, ২৪ ঘণ্টায় হোম ডেলিভারি ইত্যাদি।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বাড়ি বদলের সময় একটি পরিবারে ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রীর গড় ওজন হয় সাধারণত ১১০০ থেকে ৩৪০০ কেজি। মার্কিনীদের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ নিদেনপক্ষে ৩৬০০ কেজি।

সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যান অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবার তাদের বার্ষিক আয়ের প্রায় অর্ধেকই ব্যয় করে অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য কেনার পেছনে। প্রতিটি পরিবার গড়ে ২৪৮টি পোশাক ও ২৯ জোড়া জুতার মালিক। উপরন্তু, প্রতি বছর প্রায় ৮৪ হাজার টাকা ব্যয় করে তারা গড়ে আরো ৬৪টি পোশাক ও সাত জোড়া জুতা কেনে।

সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্যটি হলো, পৃথিবীর মোট শিশুর মাত্র ৩.১ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে। অথচ, বিশ্বজুড়ে শিশুদের জন্যে বিক্রি হওয়া খেলনার ৪০ শতাংশের মালিক মার্কিন শিশুরা!

পরিস্থিতি আগাম বুঝেই হয়তো অর্থনীতিবিদ ভিক্টর লেবো সেই ১৯৫৫ সালে বলেছিলেন, ‘মার্কিনীদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভোগবাদিতা। খাওয়াদাওয়া আর ফুটির মাঝেই তারা জাগতিক সুখ ও আত্মিক মুক্তির সন্ধান করে চলেছে।’

কেনাকাটার লাগামহীন এই হিড়িক মার্কিনীদের আটকে ফেলেছে পণ্যদাসত্বের শেকলে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে সে-দেশের পুরো সামাজিক কাঠামো। বিশেষজ্ঞদের এমনটাই মন্তব্য। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক স্টেফানি প্রেস্টন তার দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ থেকে বলছেন, যখন কেউ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিষণ্ণ থাকে তখন কেনাকাটার ব্যাপারে তার আগ্রহ আরো তীব্র হয়। বর্তমানে প্রতি ছয় জন মার্কিনির একজন দুশ্চিন্তাজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত।

গবেষণায় দেখা গেছে, কেনাকাটা করার সময় মস্তিষ্কে ডোপামিন

হরমোন নিঃসরণ হয়ে থাকে। তাই দুশ্চিন্তা-উদ্বেগে আক্রান্ত অনেক মার্কিনি যখন পণ্য কেনার মহোৎসবে মেতে ওঠে, তখন হয়তো তারা সাময়িকভাবে উৎফুল্ল হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই অভ্যাস দীর্ঘমেয়াদে মানসিক প্রশান্তি তো দেয়ই না, বরং ঘটে উল্টোটা।

কারণ আমরা যেসব জিনিস কিনে ঘর সাজাই, সেগুলো প্রাণহীন হলেও এসব বস্তু আসলে আমাদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অহেতুক কেনা পণ্যে ঠাসা ঘর মস্তিষ্কে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয় স্ট্রেস সৃষ্টিকারী হরমোন কর্টিসোলের নিঃসরণ। ফলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য দুটোই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে (এবং গোটা বিশ্বজুড়েই) এই পণ্যপ্রীতি ও তার ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিগত-পারিবারিক-সামাজিক অস্থিরতা ও হাইপারঅ্যাকুইজিশন সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল মূলত এটাই প্রমাণ করে যে, এ যুগে পণ্যের পরিমাণ যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে মানুষের অভাববোধ। অনেক কিছু কিনেও মানুষ পারছে না তৃপ্ত হতে। মিটছে না তার অভাব।

কারণ শান্তির খোঁজে আত্মনিমগ্নতা ও আত্মশক্তি জাগরণের পথ ছেড়ে সে যতই বেছে নিক পণ্যের প্রাচুর্য আর আসুক হাজারো তথ্যের প্লাবন—কোনোটাই শেষপর্যন্ত তাকে দিতে পারে না সত্যিকারের প্রশান্ত জীবন।

তথ্যসূত্র : টাইম, ২৩ মার্চ ২০১৫

আবেগ বা চাকচিক্য দ্বারা
প্রভাবিত হয়ে নয়;
শুধু প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই
কেনাকাটা করুন।



নিয়মিত
রাত্রি জাগরণে
স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে

ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি মোদের বাড়ি এসো/ খাট নেই পালঙ্ক নেই খোকার চোখে বসো। যুগ পাল্টে গেছে। স্মার্টফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ এমন নানা প্রযুক্তিপণ্যের সহজলভ্যতা, শ-খানেক টিভি চ্যানেল আর ফেসবুক-বিপ্লবের ঝড়ে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিরা বহু আগেই প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। না পালিয়ে উপায় কী? ঘুমতাড়ানি ডিজিটাল দৈত্যদের আগ্রাসনে ওদেরই যে চিরতরে ঘুম হারানোর দশা!

ক্রমাগত রাত জাগছেন?

স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে

আপনি হয়তো রাতের পর রাত জেগে টিভিতে টক শো কিংবা মুভি-সিরিয়াল দেখছেন, নয়তো একটু পর পর দেখে চলেছেন আপনার ফেসবুক স্ট্যাটাসে কয়টা লাইক পড়ল। নিশ্চিত জেনে রাখুন, প্রতিরাতে আপনি নীরবে ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছেন মনোদৈহিক স্বাস্থ্যদুর্ভোগের ঝুঁকি।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, হঠাৎ দু-একদিন জরুরি প্রয়োজনে রাত জাগতে হতেই পারে। কিন্তু ক্রমাগত রাতজাগার ফলে একজন মানুষের দেহঘড়িতে দেখা দিতে পারে মারাত্মক গোলযোগ। যার পরিণতিতে তিনি আক্রান্ত হন স্লিপ ডিজঅর্ডার, অপরিণত বয়সে হৃদরোগ, বিষণ্ণতা এমনকি পারিবারিক অশান্তিতে।

গবেষণায় দেখা গেছে, বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মধারাকেও শ্লথ করে তোলে টানা রাত্রি জাগরণ। সৃজনশীলতা, প্রাণবন্ততা, কর্মতৎপরতা কমে যায় এতে। অন্যদিকে স্বাভাবিক জৈব-ছন্দ অনুসারে প্রতিদিন পরিমিত ঘুম ও বিশ্রাম হলে স্মৃতিশক্তি হয়ে ওঠে সংহত এবং তা প্রয়োজনের সময় কাজও করে ভালোভাবে।

প্রাকৃতিক জৈব-ছন্দ : দিনে কাজ, রাতে ঘুম

প্রত্যেক মানুষের শরীরেই আছে একটি প্রাকৃতিক জৈবঘড়ি, যা নিয়ন্ত্রণ করে হরমোন প্রবাহসহ আমাদের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ড। তার কথা হলো, দিনে কাজ করো, আর রাতটা রেখো তৃপ্তিময় সুনিদ্রার জন্যে। কিন্তু আপনি যখন দিনের পর দিন এই স্বাভাবিক জৈব-ছন্দকে প্রভাবিত করেন,

দেহঘড়িতে বাধে গোলমাল। ফলে জ্বর জ্বর ভাব, ঠান্ডা লাগা, এসিডিটি-র পাশাপাশি দুর্বল হতে থাকে আপনার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

মানবদেহের বিভিন্ন হরমোন ও এনজাইমগুলোর মাত্রা সকাল-সন্ধ্যা ভেদে তারতম্য ঘটে। যেমন : কর্টিসোল। মানবদেহের শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী এ হরমোনটির নিঃসরণ-মাত্রা দিনের প্রথমার্ধে থাকে সর্বোচ্চ পরিমাণে এবং এরপর থেকে কমতে থাকে। কিন্তু টানা রাত্রি জাগরণের ফলে এই প্রাকৃতিক নিয়ম পাটে যায়। বিঘ্নিত হয় স্বাভাবিক হরমোন প্রবাহ।

গবেষকরা বলছেন, কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, ক্রমাগত রাত জেগে তার কোনো সমস্যা হইছে না, ভালোই সয়ে গেছে। এ-ক্ষেত্রে গবেষকদের ভাষ্য হলো, যারা অ্যালকোহলিক তারাও এই যুক্তিই দেন-‘আমার তো কোনো সমস্যা হয় না, বরং কিছুটা পান করলেই আমি বেশ চনমনে থাকি আর আমি মাতালও হই না।’ কিন্তু ক্ষতি যেদিকে যা হওয়ার ঠিকই হয়, যা-ই তারা বলুক।

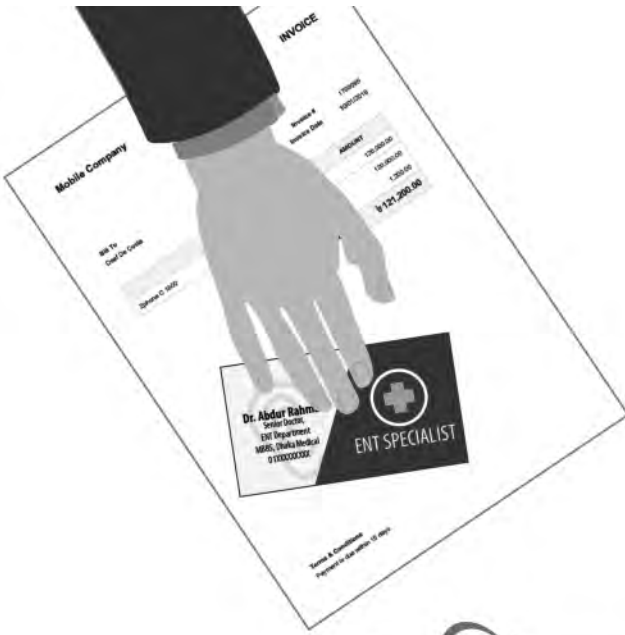
রাতে নিয়মিত ঘুম পরিপাকতন্ত্রকে সুস্থ রাখে দেহের ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে

যোগশাস্ত্র অনুসারে, সূর্যের গতিবিধি পরিপাকতন্ত্রের কর্মপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। মানব পরিপাকতন্ত্র সবচেয়ে ভালো কাজ করে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ে। রাত বাড়ার সাথে সাথে ক্রমশ কমতে থাকে খাবার হজমে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন এনজাইম নিঃসরণের পরিমাণ।

ফলে আমরা যখন রাত জাগি ও রাতের খাবারটা খাই দেরি করে, ওটা ভালো হজম হয় না। এজন্যে প্রায়শই রাত জাগেন যারা, হজমযন্ত্রের গোলমাল তাদের একটি সাধারণ সমস্যা। অন্যদিকে রাতে শীঘ্র খাবার গ্রহণ ও পরিমিত ঘুম পরিপাকতন্ত্রকে রাখে সুস্থ এবং ওজনও থাকে নিয়ন্ত্রণে।

এসব তথ্য বিবেচনায় স্বাস্থ্যগবেষকরা বলছেন, ছন্দময় মনোদৈহিক সুস্বাস্থ্য এবং গতিময় কর্মব্যস্ত জীবনের জন্যে প্রতিরাতে পরিমিত ঘুমান। তাতে আপনি সারাদিনই থাকবেন কর্মতৎপর চটপটে সৃজনশীল ও তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

তথ্যসূত্র : হেলথ এন্ড নিউট্রিশন, জানুয়ারি ২০১৬



বেশি কথা মোবাইলে কান যাবে অকালে



সুইজারল্যান্ডের জুরিখের একটি স্কুল। বছর চারেক আগে সে স্কুলের শিক্ষার্থীরা হঠাৎ কেমন অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করল। শিক্ষকরাও যেন কিছুটা বদমেজাজি ও খিটখিটে হয়ে উঠলেন। প্রাথমিক অনুসন্ধানে এর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

পরবর্তীতে জানা গেল, স্কুল-সংলগ্ন মোবাইল ফোনের অতিকায় টাওয়ার থেকে নির্গত রেডিয়েশনই এর প্রধান কারণ, যা মানবমস্তিষ্কের সহ্যশক্তির অতীত। মোবাইল কোম্পানির নামে মামলা হলো। বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে টাওয়ার সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো তারা।

আমাদের দেশেও যত্রতত্র বসানো হচ্ছে মোবাইল টাওয়ার। জনসংখ্যা অনুপাতে বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর সর্বোচ্চ মোবাইল ব্যবহারকারীর দেশ! গাড়ি চালাতে চালাতে বা রেললাইনের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফোনে কথা বলছে, এমন দৃশ্য আজকাল অহরহই দেখা যায়। সাথে মরণঘাতী সেলফির হুজুগ তো আছেই। প্রশ্ন হলো, মোবাইল ফোন ব্যবহার কি বিপদজনক? এটা আসলে বিপদজনকের চেয়েও অনেক বেশি কিছু।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী, একটি মোবাইল ফোন মাইক্রোওয়েভ ওভেনের সমপরিমাণ রেডিয়েশন ছড়িয়ে থাকে। ১৫ মিনিট একটানা মোবাইলে কথা বললে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন বাড়তে থাকে। ফলে কান-সংলগ্ন ত্বক আগুনের মতো লাল হয়ে যায়। কান গরম হয়ে যায়, শুরু হয় মাথাব্যথা।

এখানেই শেষ নয়। এর সাথে আছে এন্টেনার রেডিয়েশন, যা মস্তিষ্কের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে ১০৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট অবধি। আমরা জানি, ১০১ ডিগ্রিতেই শিশুদের খিঁচুনি হয়। তাহলে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা যখন ১০৩ ডিগ্রিতে ওঠে তখন তার টিস্যুগুলোর কী অবস্থা হচ্ছে! ভেবে দেখুন একবার। কী পরিমাণ খিঁচুনি ওখানে হচ্ছে।

ভারতের টেলিযোগাযোগ ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার প্রণীত খসড়া নীতিমালায় বলা হয়েছে, বেজ স্টেশনের এন্টেনা থেকে নির্গত ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের প্রভাবে মারাত্মক ক্ষতির শিকার হন অন্তঃসত্ত্বা নারী ও ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুরা। বাচ্চা খেতে না চাইলে অনেক মা মোবাইলে কিছু একটা চালু করে দেন। বাচ্চা ওটা একঘণ্টা ধরে দেখতে থাকে আর

মা তাকে খাইয়ে দেন। কিন্তু তিনি খেয়াল করেন না যে, সন্তান এই একঘণ্টা ধরে রেডিয়েশনও হজম করছে। অর্থাৎ পুষ্টি যতটুকু নিচ্ছে তার চেয়ে অপুষ্টি নিচ্ছে বরং বেশি। তাই দীর্ঘ গবেষণার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা বলছেন, বয়স ১৬ হওয়ার আগে কোনো অবস্থাতেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করা উচিত নয়।

সাম্প্রতিক সময়ে অটিজম-আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বিশ্বজুড়েই বেড়ে যাচ্ছে আশঙ্কাজনকভাবে। ১৯৮০ সালে যা ছিল প্রতি ৫০০ জনে একজন, এখন সেটা প্রতি ৬৮ জনে একজন! অটিজমে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি দক্ষিণ কোরিয়ায়। এর অন্যতম কারণ হিসেবে সে-দেশের বিজ্ঞানীরা যে বিষয়গুলোকে দায়ী করছেন-তার মধ্যে মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন অন্যতম।

মোবাইল ফোনে বহু সময় ধরে কথা বললে আপনি অবসন্ন হয়ে পড়বেন, মাথাব্যথা করবে। অনেকক্ষণ কথা বলে ঘুমাতে গেলেন, ঘুম আসবে না। আর বিরামহীনভাবে যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন তাদের স্মৃতিশক্তি ধস নামে এবং কাঁধ, কনুই ও কজির জয়েন্ট ক্রমশ অকেজো হয়ে যায়।

মস্তিষ্কে সুরক্ষা দেয়ার জন্যে এর চারপাশে ‘ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার’ নামে একটি আবরণ আছে। অল্প কিছু ছাড়া অধিকাংশ ওষুধই এই দেয়াল অতিক্রম করতে পারে না। এই দেয়ালের জন্যেই অনেক ওয়েভ ব্রেনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু অনেক সময় ধরে মোবাইল ফোনে কথা বলার ফলে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং এর রক্তনালীগুলো সম্প্রসারিত হয়ে ওঠে। রক্তনালীর দেয়ালগুলো তখন উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর মোবাইলের মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশন সরাসরি এন্ডোথেলিয়াল সেলের প্রোটিন কাঠামোকে বদলে দেয়, সে সুযোগে টক্সিন মস্তিষ্কের ভেতরে প্রবেশ করে।

আরেকটি সাধারণ প্রশ্ন হলো, মোবাইলের রেডিয়েশন কি ব্রেন টিউমার সৃষ্টি করতে পারে? টক্সিনের প্রভাবে নার্ভ সেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডিএনএ-র কর্মকাঠামো বদলে যায়। কোনো ডিএনএ যদি একবার অস্বাভাবিক হয়ে যায়, তাহলে সে সবসময় অস্বাভাবিক ডিএনএ-ই রেপ্লিকেট করবে। ফলে ব্রেন টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

ব্রেন ক্যান্সার সংক্রান্ত বিস্তারিত গবেষণার আলোকে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, একজন মানুষ যদি এক থেকে পাঁচ বছর অতিমাত্রায় মোবাইল ফোন

ব্যবহার করেন, তাহলে তার ব্রেন টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় ১২৫ শতাংশ। পাঁচ থেকে ১০ বছর ব্যবহার করলে সম্ভাবনা বাড়ে ২৫০ শতাংশ। আর যারা ১৫ বছর ধরে ব্যবহার করছেন তাদের সম্ভাবনা বাড়ে ২৭৫ শতাংশ পর্যন্ত! সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কানের পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ স্যালাইভা গ্ল্যান্ডের টিউমার বাংলাদেশে বহুগুণ বেড়ে গেছে। এর পেছনেও আছে মোবাইল ফোনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। তাই বলা যায়, বেশি কথা মোবাইলে, কান যাবে অকালে!

এখন করণীয় কী? প্রথমত, মোবাইল ফোন ব্যবহারের সময়সীমা কমিয়ে দিতে হবে। মোবাইলে কারো সাথে আলাপের আদর্শ সময় হলো ২০ সেকেন্ড। তিন মিনিটের বেশি তো কোনোভাবেই নয়। যদি কেউ তিন মিনিট কথা বলে ফেলেন, তাহলে পরবর্তী ১৫ মিনিটের মধ্যে তার আর ফোন ব্যবহার করা একেবারেই উচিত হবে না।

দ্বিতীয়ত, হেডসেট বা স্পিকার ব্যবহার করুন। অ্যানালগ বা ল্যান্ডফোন যদি হাতের নাগালে থাকে তাহলে সেলফোন ব্যবহার করবেন না। পারতপক্ষে মোবাইল ফোন শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আবার অনেকে আছেন যারা ঘুমানোর সময় ফোনটি বিছানায় এমনকি মাথার ঠিক কাছেই রাখেন, এটা কখনোই করা যাবে না।

তৃতীয়ত, যত্রতত্র মোবাইল ফোনের এন্টেনা বসানো যাবে না।

আসলে যে-কোনো ব্যাপারে ব্যক্তিগত সচেতনতাই সবচেয়ে জরুরি। এটা মেনে নিতেই হবে যে, মোবাইল ও কম্পিউটার আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। অনেক কাজ আগের চেয়ে বেশ সহজ হয়ে গেছে সত্যি, কিন্তু এদের আবার কিছু অদৃশ্য বিপদও আছে। এই স্বাস্থ্যঝুঁকিগুলোর ব্যাপারে পূর্বসতর্কতা নিলে আমরা নিরাপদে থাকতে পারব। আর আমাদের সুস্বাস্থ্যের জন্যেই সেটা জরুরি।

তথ্যসূত্র : কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসিক মুক্ত আলোচনায় (১ মে ২০১৭)
বিএসএমএমইউ-এর সাবেক উপাচার্য ও প্রখ্যাত নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ
অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্তের আলোচনার নির্বাচিত অংশ



facebook

আসক্তি

মাদকাসক্তির মতোই
ভয়ংকর



বিশ্বব্যাপী ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা সম্প্রতি ২০০ কোটি ছাড়িয়েছে। পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও। এগোচ্ছে রীতিমতো পাল্লা দিয়ে। সমীক্ষা বলছে, বর্তমানে পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ফেসবুক ব্যবহারকারীর শহর আমাদের এই ঢাকা মহানগরী! তবে এ সংবাদে আনন্দিত হওয়ার সুযোগ নেই মোটেই। কেননা গবেষকদের মতে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষকে ক্রমেই পরিণত করছে অসামাজিক নিক্রিয় প্রাণীতে।

লাইক : নকল আনন্দের বাহারি ঝুমঝুমি

ফেসবুক দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ‘লাইক’ ফিচারটি চালু হওয়ার পর। লাইক পাওয়ার জন্যে উসকানিমূলক মন্তব্য বা ছবি পোস্ট করার ঘটনাও কম নয়। মজার বিষয়, লাইকের উদ্ভাবক জাস্টিন রোজেনস্টাইন নিজের ফোন থেকে এই ফিচারটি সরিয়ে ফেলেছেন। কেন? আসক্ত হওয়ার ভয়ে!

শুধু তা-ই নয়। অন্যান্য সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাপও তিনি ফোন থেকে মুছে দিয়েছেন। একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘এসব অ্যাপ মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং মানুষকে আসক্ত করে তোলে।’ অ্যাপের নির্মাতারা সাবধানতা অবলম্বন করলেও অধিকাংশ ব্যবহারকারীই এ ব্যাপারে মোটেই সচেতন নন।

আহাম্মকে পরিণত হচ্ছেন না তো?

ফেসবুক যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগের বারোটা বাজায়, তাই কোনো বিষয়ে মনোনিবেশ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যক্তির চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং আইকিউ লেভেলও কমতে থাকে ধীরে ধীরে। তাই সহজে আহাম্মক হতে চাইলে দীর্ঘসময় ফেসবুক ব্যবহার করে যে-কেউ পেতে পারে চমৎকার ফল।

কমছে মনোযোগ!

২০১৫-তে মাইক্রোসফটের সমীক্ষা অনুযায়ী, স্মার্টফোন-বিপ্লব ঘটান আগে মানুষের মনোযোগের স্প্যান ছিল ১২ সেকেন্ড। এখন তা দাঁড়িয়েছে মাত্র আট সেকেন্ডে। আর সবচেয়ে কম মনোযোগের খেতাবধারী গোল্ডফিশের

স্প্যান? নয় সেকেন্ড! সাড়ে সর্বনাশ ঘটীর আগেই সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা।

সম্প্রতি একই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন আমাদের দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল—‘আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়াই তারা সবাই একটা বিষয় লক্ষ করেছি। গত কয়েক বছর থেকে ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা কমে আসছে। অনেক সময়েই মনে হয় পড়ানোর সময় আমি যেটা বলছি ছাত্রছাত্রীরা সেটা শুনছে, কিন্তু বোঝার জন্যে মস্তিষ্কটি ব্যবহার করতে তাদের ভেতর এক ধরনের অনীহা, এক ধরনের আলস্য।

এ নিয়ে কোনো গবেষণা হয় নি। আমার কাছে কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, এটি ফেসবুক জাতীয় সামাজিক নেটওয়ার্কে বাড়াবাড়ি আসক্তির ফল। এটি নিশ্চয়ই শুধু আমাদের দেশের সমস্যা নয়, সারা পৃথিবীর সমস্যা। একাধিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে দেখেছি, মাদকে আসক্তি এবং ফেসবুকে আসক্তির মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই।’ (দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০১৭)

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচ ডিভোর্সের একটিতে দায়ী ফেসবুক!

দাম্পত্য সম্পর্ক ভাঙতেও ইদানীং দারুণ (!) ভূমিকা রাখছে ফেসবুক। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচটি ডিভোর্সের অন্তত একটির পেছনে ফেসবুক ভূমিকা রাখছে বলে একটি জরিপে জানা গেছে। সেই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফেসবুকের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অজান্তে এমন সব নারী-পুরুষের সঙ্গে একান্ত সম্পর্ক গড়ে তুলছেন যাকে অবিশ্বস্ততা বলা যায়। যার ক্রমবর্ধমান বলি হয়ে উঠছে দাম্পত্য সম্পর্কগুলো।

আমেরিকান একাডেমি অব ম্যাট্রিমনিয়াল লইয়ার্স দেশটিতে সংঘটিত সাম্প্রতিক কিছু ডিভোর্সের ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে। দেখা গেছে, ফেসবুক ব্যবহার করে স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে পরস্পরকে প্রতারণা করার হার দিন দিন বাড়ছে। ফেসবুকের মাধ্যমে তারা অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলছেন। মার্কিন আদালতে ডিভোর্স আবেদনে বাদীর পক্ষের শতকরা ৬৬ জন আইনজীবী অনৈতিক সম্পর্কের প্রমাণ হিসেবে ফেসবুক থেকে নেয়া তথ্য ব্যবহার করছেন! ব্রিটেনেও প্রতি একশ-র মধ্যে ২০টি ডিভোর্সের ঘটনায় ভূমিকা রাখছে ফেসবুক।

স্টিভ জবস ও বিল গেটস ॥

প্রযুক্তিপণ্য থেকে ঠিকই দূরে রেখেছেন নিজের সন্তানদের

মাইক্রোসফট-এর প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস ও অ্যাপল-এর প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবস। তাদের কল্যাণে (!) স্মার্টফোন, আইপ্যাড ও কম্পিউটার গেমস পৌঁছে গেছে কোটি মানুষের দুয়ারে। অথচ এই প্রযুক্তিবিদরা নিজেদের সন্তানদের ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে শুরু থেকেই জারি করে রেখেছিলেন কঠোর নিষেধাজ্ঞা। বিল গেটস তার সন্তানদের বয়স ১৪ হওয়ার আগে মোবাইল ফোন কিনে দেন নি, কম্পিউটারও ব্যবহার করতে দিতেন দিনে মোটে ৪৫ মিনিটের জন্যে। আর স্টিভ জবস তো নিজের উদ্ভাবিত আইপ্যাডই কখনো ব্যবহার করতে দেন নি সন্তানদের।

এ সতর্কতা অবলম্বনের কারণ হলো তারা ঠিক জানেন, আইপ্যাড-আইফোন জাতীয় প্রযুক্তিপণ্যগুলো মানুষকে অতিমাত্রায় আসক্ত করে তোলে। তাই মুনাফার লোভে অপরের ঘরে অশান্তির কাঁচামাল জোগান দিলেও নিজের ঘর তারা সাধ্যমতো আগলে রেখেছেন ঠিকই।

তাই নিত্যনতুন প্রযুক্তিপণ্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিজে সচেতন হোন। এবং সেইসাথে সন্তানদের হাতে স্মার্টফোন-আইপ্যাডরূপী এসব আসক্তি-উপকরণ তুলে দেয়ার আগে আরেকবার ভাবুন।

বাড়ছে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা

২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের অর্থায়নে ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ স্কুল অব মেডিসিন একটি গবেষণা চালায়। ১,৭৮৭ জন মার্কিন তরুণের জীবনাভ্যাস পর্যালোচনা করে গবেষকরা রায় দেন, একজন তরুণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যত বেশি সময় কাটাবে, তত সে হতাশ একাকী ও বিষণ্ণ হয়ে পড়বে। গবেষকরা তাই ফেসবুককে আখ্যায়িত করেছেন ‘অবসাদগ্রস্ত মানুষের আখড়া’ হিসেবে।

গত কয়েক বছরে মার্কিন টিনএজারদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার পেছনেও স্মার্টফোনের বড় ভূমিকা আছে বলে মনে করছেন সে-দেশের মনোবিজ্ঞানীরা।

তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান, ৬ অক্টোবর ২০১৭
দ্য টেলিগ্রাফ, ৬ মার্চ ২০১৭



ডিজিটাল
অ্যামেনেশিয়া
সচেতনতার
বিকল্প নেই



আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধুর ফোন নম্বরটা চট করে বলুন তো! কিংবা ভাবুন তো প্রিয়জনদের মধ্যে কজনের জন্মদিন-বিবাহবার্ষিকীর তারিখ মনে আছে আপনার! কিছুক্ষণ মাথা চুলকে যদি টের পান যে, এসব তথ্য আগে আরো বেশি মনে রাখতে পারতেন, তবে অবাক হবেন না। এমনটাই কি হওয়ার কথা নয়? এসব মনে রাখার ভার যে আমরা বহুদিন হলো ছেড়ে দিয়েছি আমাদের প্রিয় সেল ফোনটির মেমোরি কার্ডের ওপর।

পরিচিত কোনো শব্দের বানান নিয়ে খটকা জাগলে মস্তিষ্কে চিন্তা করার অবকাশটুকুও এখন আর দেই না আমরা। গুগল আছে না! মুহূর্তেই সে জানিয়ে দিচ্ছে সঠিক বানান। এর ফলে নিজেদের অজান্তেই আমরা শিকার হচ্ছি এক অদ্ভুত ধরনের স্মৃতিভ্রষ্টতার। হালের বিজ্ঞানী-গবেষকরা একে অভিহিত করেছেন ‘ডিজিটাল অ্যামেনেশিয়া’ নামে।

আধুনিক নাগরিক জীবনে এই স্মৃতিভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়ছে দাবানলের মতো। ইন্টারনেট কম্পিউটার মোবাইলসহ নানাবিধ প্রযুক্তিপণ্যের ওপর অহেতুক নির্ভরতা দুর্বল করে ফেলছে আমাদের স্মৃতিশক্তিকে। ইউরোপের আটটি দেশের ছয় হাজার মানুষের ওপর দীর্ঘ দেড় বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে একথা জানিয়েছে সাইবার নিরাপত্তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ক্যাসপারস্কি ল্যাব।

গবেষণায় দেখা গেছে, অর্ধেকের বেশি মানুষ তাদের শৈশবের ল্যান্ডফোন নম্বরটি দিব্যি স্মরণ করতে পারছেন। অথচ তার পরিবারের সদস্যদের কিংবা নিজ কর্মস্থলের নম্বর বলতে পারছে না। প্রতি তিন জনের একজন স্বীকার করেছেন যে, ফোনবুক না দেখে সন্তানের স্কুলে তো দূরের কথা, তিনি তার স্বামী/স্ত্রীকেও ফোন করতে পারবেন না। আর অনলাইনে পাওয়া একটি তথ্য ব্যবহার করার পরপরই তা ভুলে যান অন্তত ২৫ শতাংশ মানুষ।

বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ড. মারিয়া উইম্বার বলেন, ‘মস্তিষ্কে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি গঠনের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে সেলফোন ও কম্পিউটারে তথ্য খোঁজার প্রবণতা। সাধারণত কোনো তথ্য যদি আমরা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করি, মস্তিষ্ক সেটাকে আরো দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে রূপ দেয়। কিন্তু একই তথ্য বার বার ইন্টারনেট যেঁটে বের করলেও তা সমান

উপকারিতা দেয় না। পর্দায় আঙুল চেপে তথ্যটি যেমন দ্রুত পাচ্ছি, ততোধিক দ্রুততার সাথে তা আবার স্মৃতি থেকে মুছে যাচ্ছে।’

ডিজিটাল অ্যামনেশিয়ায় ক্রমশ আক্রান্ত হচ্ছেন সব বয়সের মানুষ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গ্যাজেটের প্রতি আসক্তি মানুষকে নির্বোধে পরিণত করেছে। প্রিয় গ্যাজেট বা অ্যাপ যতক্ষণ কাজ করেছে, ততক্ষণ সে সকল কাজের কাজী। আর যদি কোনো কারণে সেটি না ঘটে, তখন সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তখন বোঝা যায়, যন্ত্র-নির্ভরতা কেবল সহজাত দক্ষতাই কমায় নি, সেইসাথে কমন সেন্স বা সহজাত বিচারবুদ্ধিও হ্রাস করেছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে।

তাই প্রিয় পাঠক, ইন্টারনেট ও প্রযুক্তিপণ্যের যথোচ্চ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। বাঁচুন অকালে স্মৃতিনাশের খপ্পর থেকে।

তথ্যসূত্র : রিডার্স ডাইজেস্ট, সেপ্টেম্বর ২০১৬

বিবিসি.কম, অক্টোবর ২০১৫

মন যত প্রশান্ত ও সুস্থির হবে,
তথ্য ধারণ ও মনে রাখা
তত সহজ হবে।
মেডিটেশনই মনকে
প্রশান্ত ও সুস্থির করে।



পেইনকিলারে
ব্যথা নয়

ক্ষয় হয়
প্রাণ!



পেইনকিলার আসক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক রাজ্যজুড়ে এ এখন দেখা দিয়েছে এক নতুন মহামারী হিসেবে। সে-দেশের সরকার, বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নর এবং স্বাস্থ্যবিদরা উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে রীতিমতো উদ্দিগ্ন।

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের (২০১৬) প্রভাবশালী প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে পর্যন্ত সে-দেশের সাধারণ মানুষের দাবির প্রেক্ষিতে এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে হয়েছিল বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচারণায়। এমনকি সুপরিচালিত প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে, কীভাবে তিনি এই নীরব মহামারী প্রতিহত করবেন।

মূলত ওপোয়েড গোত্রীয় ব্যথানাশকগুলোই (মরফিন, অক্সিকোডোন, হাইড্রোকোডোন ইত্যাদি) তীব্র আসক্তি সৃষ্টি করেছে ভোক্তাদের মাঝে। কারণ এগুলোর আর হেরোইনের রাসায়নিক গঠন (কেমিকেল স্ট্রাকচার) একই রকম! এ-ছাড়াও দেহে হেরোইনের মতো একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এই মরফিন।

তাই ক্রনিক ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে মোটামুটি যারাই একবার এসব ওষুধ সেবন করছেন বা শিরাপথে ওপোয়েড জাতীয় ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন, তারা জড়িয়ে যাচ্ছেন ভয়াবহ নেশার জালে। এমনকি বেড়ে যাচ্ছে এইডস রোগীর সংখ্যা! কীভাবে?

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন-এর অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মরফিনের মতো ব্যথানাশকে আসক্ত হয়ে বাহ্যবিচারহীনভাবে চলছে ইচ্ছেমতো ইঞ্জেকশন নেয়া। একই সুঁচ দিয়ে একাধিকবার ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন একাধিক মানুষ।

এমনও ঘটনা আছে যে, একই ব্যক্তি দিনে ২০ বার পর্যন্ত ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন। কখনো আবার দেখা গেছে, একই পরিবারের তিন প্রজন্ম ব্যথানাশক ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন একই সুঁচ ব্যবহার করে!

আর এদের অধিকাংশই এসব ওষুধে আসক্ত হয়ে পড়ছেন চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে। বলা হচ্ছে, গোটা আমেরিকা জুড়ে প্রায় ১০০ মিলিয়ন মানুষ আর্থ্রাইটিস, মাইগ্রেন, ব্যাকপেইনসহ নানারকম ক্রনিক ব্যথায় আক্রান্ত। (এ যেন এক ব্যথাভারাক্রান্ত জাতি!)

যা-হোক, এর ফলে প্রতিদিনই বিপুল সংখ্যক আমেরিকান ব্যথার প্রতিকার চেয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছেন। আর চিকিৎসকরাও সমানে পরামর্শ দিচ্ছেন এসব ব্যথানাশকের। যারা আবার চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র জোগাড় করতে পারছেন না, তারা ঠিকই এসব ওষুধ সংগ্রহ করে নিচ্ছেন কালোবাজার থেকে।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ-এর মতে, ওপোয়েড সেবনকারী ৯৪ লক্ষ আমেরিকানের মধ্যে ২১ লক্ষই এতে আসক্ত হয়ে পড়েছেন এবং এরা এসব ওষুধের জন্যে কালোবাজারের খপ্পরে পড়ার ঝুঁকিতে আছেন।

আরো ভয়াবহ তথ্য শুনবেন? যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচ জন হেরোইন সেবনকারীর চার জনই জানিয়েছেন, নেশার জগতে তাদের প্রবেশ ঘটেছে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রে উল্লিখিত ব্যথানাশক সেবনের পথ ধরে! আর গড়ে ৪৬ জন মানুষ প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করছেন মরফিন ওভারডোজের কারণে। এবং হেরোইন সেবনজনিত কারণে মৃত্যুর হার এর দ্বিগুণ!

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এ-ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছেন মধ্যবয়সী আমেরিকানরা। বর্তমানে যে-কোনো দুর্ঘটনা ও সহিংসতাজনিত মৃত্যুর চেয়েও অতিরিক্ত ওপোয়েড সেবনজনিত কারণে মধ্যবয়সীদের মৃত্যুহার সে-দেশে ঢের বেশি!

শুরুতে অবস্থা এমন ছিল না। বিশ শতকের প্রায় পুরোটা সময় জুড়ে ক্রনিক ব্যথার রোগীরা প্যারাসিটামল ও এসপিরিন জাতীয় ওষুধ সেবন করতেন। হেরোইনের জ্ঞাতিভাই মরফিন তখন ব্যবহৃত হতো শুধু হাড়ভাঙা এবং সার্জারি-পরবর্তী ব্যথার ক্ষেত্রে, তা-ও খুব স্বল্পমেয়াদী ডোজে। আর দীর্ঘদিন মরফিন সেবনে আসক্তির ঝুঁকি বাড়ে বলে দীর্ঘমেয়াদী ডোজে এটি ব্যবহৃত হতো কেবল অন্তিম পর্যায়ে ক্যান্সার রোগীদের ব্যথামুক্তির জন্যে।

কিন্তু আশির দশকের শেষদিকে এসে পরিস্থিতি হঠাৎ করেই বদলে যেতে শুরু করে। যে-কোনো ক্রনিক ব্যথার জন্যেও চিকিৎসকেরা মরফিন জাতীয় ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে শুরু করেন হরদম। যদিও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্রনিক ব্যথার ক্ষেত্রে মরফিনের উপযোগিতা যে-সমস্ত গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে সে-সব খুবই দুর্বল মানের গবেষণা!

এ-ছাড়াও গুরুতর অভিযোগের তীর উঠেছে ওষুধ কোম্পানিগুলোর দিকে। যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসকদের জন্যে সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত বেশ

কিছু প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে (মূলত ব্যাথা নিরাময় বিষয়ক) বিপুল পরিমাণ অর্থ সহায়তা দিচ্ছে তারা। ২০০৭ সালে সে-দেশের ‘ফেডারেশন অব স্টেট মেডিকেল বোর্ডস’-কে ব্যাথা নিরাময় বিষয়ক একটি গাইডলাইন বুক প্রকাশের জন্যে মরফিন জাতীয় ওষুধ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো অনুদান দিয়েছে ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ডলারেরও বেশি অর্থ।

ব্যাথা নিয়ে ব্যবসা রীতিমতো জমজমাট!

তথ্যসূত্র : টাইম, ১৫ জুন ২০১৫

দিনে অন্তত কয়েকবার
প্রাণ খুলে হাসুন।
হাসি দমকে স্বাভাবিক করে,
পেশির ব্যাথা দূর করে,
রক্তচাপ কমায়,
রোগ নিরাময়কে দ্রুততর করে।



দেশে
মেদসুলতার
হার বাড়ছে!

সচেতন
হোন
এখনই



মেদস্থূলতা! সাম্প্রতিক কয়েক দশকে সারা পৃথিবীজুড়েই স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের কাছে এটি দেখা দিয়েছে এক মূর্তিমান আতঙ্করূপে। এদেশেও আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে এর হার। সম্প্রতি বাংলাদেশের শহর এলাকাগুলোতে বসবাসরত নারী ও শিশুদের ওপর পরিচালিত একটি জরিপে এমন তথ্য মিলেছে। গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআর,বি)-র একদল গবেষক।

তারা বলেন, দেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ জন অতিরিক্ত ওজনধারী, আবার এদের মধ্যে শতকরা চার জন ভুগছেন মেদস্থূলতায়। এ-ছাড়াও সারা পৃথিবীতেই মেদস্থূলতার হার বাড়ছে আশঙ্কাজনকভাবে। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিক্স এন্ড ইভাল্যুশন-এর একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, ১৯৮০ সালের (শতকরা ২ জন) তুলনায় ২০১৩ সালে (শতকরা ৪ জন) এসে বিশ্বজুড়ে মেদস্থূলতার পরিমাণ বেড়েছে দ্বিগুণ।

এখানে উল্লেখ্য, প্রত্যেক মানুষের উচ্চতা ও ওজন অনুসারে মেদস্থূলতা পরিমাপের একটি সার্বজনীন পদ্ধতি হলো বিএমআই (বডি মাস ইনডেক্স)। বিএমআই নির্ণয়ের উপায় : দেহের ওজন কিলোগ্রামে/ (উচ্চতা মিটারে)^২। এভাবে কারো বিএমআই মান যদি ১৮.৫ থেকে ২৫-এর মধ্যে হয় তবে তিনি স্বাভাবিক ওজনধারী। ২৫-এর বেশি হলে তিনি অতিরিক্ত ওজনধারী। আর বিএমআই মান ৩০-এর বেশি হলে তিনি স্থূলকায় বা মেদস্থূল বলে বিবেচিত হবেন।

আইসিডিডিআর,বি-র উদ্যোগে দেশের সাতটি বিভাগীয় শহরে বছর কয়েক আগে পরিচালিত এ স্বাস্থ্যজরিপে দেখা গেছে, দেশে পাঁচ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের মায়েদের শতকরা ৫২ জনই অতিরিক্ত শারীরিক ওজনের শিকার এবং এদের মধ্যে ১৫ জনই মেদস্থূল। আর এ শিশুদের শতকরা ১৪ জন অতিরিক্ত ওজনধারী এবং এদের মধ্যে শতকরা চার জন মেদস্থূল।

অবস্থাপন্ন পরিবারগুলোতে শিশু-মেদস্থূলতার হার শতকরা ২৭ ভাগ, অন্যদিকে দরিদ্র পরিবারগুলোতে এই হার শতকরা ৩ ভাগ। গবেষকরা

অঞ্চলভেদে অতিরিক্ত ওজন ও মেদস্থূলতার হার		
শহর	মা (%)	শিশু (%)
ঢাকা	৫৭	২২
চট্টগ্রাম	৬৪	১৩
সিলেট	৫৭	১৯
বরিশাল	৫৫	১৭
খুলনা	৫৫	১৫
রাজশাহী	৪৩	১০
রংপুর	৩৫	০৭

(তথ্যসূত্র : আইসিডিডিআর,বি)

জানান, মাতৃ ও শিশু-মেদস্থূলতার হার সবচেয়ে বেশি হলো ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে। তাদের মতে, এ গবেষণা-কার্যক্রমে পরিণত বয়সের পুরুষরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যদিও, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও মেদস্থূলতার চিত্রটা একই।

গবেষকরা সাবধান করে দিয়েছেন-‘অতিরিক্ত ওজনধারী এবং স্থূলকায়দের ক্ষেত্রে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, অস্টিওআর্থ্রাইটিস, লিভার ও গলব্লাডারের বিভিন্ন ধরনের জটিলতা এবং শ্বাসতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি। এসব জটিলতা থেকে তাদের অকালমৃত্যুর সম্ভাবনাও বেড়ে চলে সমানতালে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা-সাময়িকী *ল্যানসেট*-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মেদবহুলতার কারণে সৃষ্ট হৃদরোগ-সংক্রান্ত জটিলতায় সারা বিশ্বজুড়ে শুধু ২০১০ সালেই ঘটেছে ৩৪ লক্ষ মৃত্যু। বিশেষজ্ঞরা জানান, বেশিমাাত্রায় উচ্চ ক্যালরিয়ুক্ত খাদ্যগ্রহণ এবং তুলনামূলক কম শারীরিক পরিশ্রমই পৃথিবীজুড়ে মেদবহুলতার অন্যতম প্রধান কারণ।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রফেসর ডা. এ কে আজাদ খান বলেন, মাত্রাতিরিক্ত চিনি ও ক্যালরিসমৃদ্ধ ফাস্টফুড ও কোমল পানীয়ের প্রতি শিশু-কিশোরদের আসক্তির ফলেই বাড়ছে তাদের মেদস্থূলতার হার। কিন্তু সে তুলনায় সংশ্লিষ্ট কোনো দিক থেকেই নেই কোনো সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। অন্যদিকে ক্রমশ কমছে শিশুদের যে-কোনো ধরনের পরিশ্রম ও খেলাধুলা করার সুযোগ।

বিশ্বজুড়ে মেদস্থূলতা

- ১৯৮০ সালের তুলনায় বিশ্বজুড়ে বর্তমানে মেদস্থূলতার হার বেড়েছে দ্বিগুণ।
- ২০১৪ সালের একটি হিসাব অনুসারে, ১৮ বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী ১৯০ কোটি (৩৯%) মানুষ অতিরিক্ত ওজনের শিকার এবং এদের মধ্যে ৬০ কোটি (১৩%) ভুগছে মেদস্থূলতায়।
- প্রায় সব দেশগুলোতেই কম ওজনের মানুষের চেয়ে অতিরিক্ত ওজনের মানুষের মৃত্যুহার অনেক বেশি।
- ২০১৩ সালের একটি হিসাব অনুসারে, বিশ্বজুড়ে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের সোয়া চার কোটি ভুগছে অতিরিক্ত ওজন ও মেদস্থূলতায়।

(তথ্যসূত্র : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)

আইসিডিডিআর,বি-র গবেষক ড. আলিয়া নাহিদ পরামর্শ দেন— স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও সুস্থ খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে স্কুলগুলোতে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়াটা খুব জরুরি। আর শহরবাসীদের খেলাধুলা ও পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রমের অভ্যাস করতে হবে। এটি বিভিন্নভাবে হতে পারে, যেমন : শহরের রাস্তাগুলোর এক পাশে সাইকেলের একটি লেন থাকতে পারে, যা নাগরিকদের শারীরিক পরিশ্রমে উদ্বুদ্ধ করবে।

তিনি এসব ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, শুধু উন্নত দেশগুলোতেই নয়, এর পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও সমানে বাড়ছে মেদবহুলতার হার। আর অতিরিক্ত ওজনের ফলে নানাভাবে বাড়ে অসংক্রামক ব্যাধির (হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি) সম্ভাবনা।

আমাদের সচেতন হওয়ার সময় এখনই। মেদস্থূলতা এবং এ-সংক্রান্ত রোগ-ব্যাধি জটিলতা প্রতিরোধে চাই বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস ও পরিশ্রমমুখক সুস্থ জীবনচাচ।

তথ্যসূত্র : দ্য ডেইলি স্টার, ২১ মার্চ ২০১৫



খুনি চেয়ারকে 'না' বলুন

সুস্থতার জন্যে
দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকুন



যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠান মেয়ো ক্লিনিক। এ প্রতিষ্ঠানের মেদস্থূলতা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রমের সহ-পরিচালক জেমস লেভিন। পেশায় এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট লেভিন কয়েক দশক ধরে মেদস্থূলতা এবং দীর্ঘক্ষণ বসে কাটানোর প্রভাব নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন। গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তার মতামত হলো—দীর্ঘসময় বসে নয়, বরং সার্বিক সুস্থতার জন্যে দিনের বেশিরভাগ সময় দাঁড়িয়ে থাকার অর্থাৎ দৈহিকভাবে সক্রিয় থাকার অভ্যেস করণ।

ডা. লেভিনের মতে, চেয়ারে বসে কাজ কিংবা নিছক আলস্যবশত দিনের একটা বড় সময় বসে কাটান যারা, দীর্ঘমেয়াদে তারা উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, মেদস্থূলতাসহ নানা রোগ-জটিলতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। অন্যদিকে এ সময়টাই যদি কাজ করা যায় দাঁড়িয়ে বা হাঁটাচলার মধ্যে, তবে এসব রোগঝুঁকি অনেকাংশে কমে আসে।

এ নিয়ে জেমস লেভিন লিখেছেন তার অনবদ্য গবেষণাগ্রন্থ *গেট আপ!*, ২০১৪ সালে যেটি যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ-ছাড়াও তিনি উদ্ভাবন করেছেন বিশেষ ধরনের ট্রেডমিল ডেস্ক, যার ওপর দাঁড়িয়ে এবং চাইলে ধীরলয়ে হেঁটে ডেস্ক-জব বা অফিসের কাজকর্ম করা যায় নিশ্চিন্তে।

দৈনন্দিন জীবনে হরেক রকম কাজে কিংবা কাজ ছাড়াও অধিকাংশ সময়ই আমরা বসে কাটাই। চেয়ারে বসে অফিসের কাজ করি, খাওয়াদাওয়া করি, মিটিংয়ে আলোচনা করি। টিভি দেখা আর আড্ডা তো আছেই। জরিপে দেখা গেছে, আমেরিকানরা তাদের কর্মজীবনের একটা বড় সময় বসেই কাটিয়ে দেয়—দিনে গড়ে প্রায় ১৩ ঘণ্টা!

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ এক প্রাণঘাতী ব্যাপার। ২০১০ সালে চিকিৎসা সাময়িকী *সার্কুলেশন* এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, সাত বছর ধরে ৮,৮০০ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, এদের মধ্যে যারা দিনে চার ঘণ্টা বা এরও বেশি সময় বসে কাটান তাদের অকালমৃত্যুর ঝুঁকি ৪৬ শতাংশ বেশি তাদের চেয়ে, যাদের ক্ষেত্রে এটি সাকুল্যে দু-ঘণ্টার বেশি নয়।

গবেষকদের মতে, দিনের অর্ধেকেরও বেশি সময় যারা বসেই কাটান তাদের ডায়াবেটিস ও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলক দ্বিগুণ।

সবমিলিয়ে মৃত্যুবুঁকি বাড়ে শতকরা ৫০ ভাগ। সব দেখে শুনে মনে হয়, চেয়ারই বুঝি হয়ে উঠেছে এক মৃত্যুফাঁদ!

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর কারণটি খুব চমকপ্রদ। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা যে স্বাস্থ্যপ্রদ নয়, তার সূত্র লুকিয়ে আছে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্বে। মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো এমনভাবে সজ্জিত যে, দিনমান সক্রিয় থাকলেই কেবল এর সুস্থতা নিশ্চিত হয়, অলস শুয়ে-বসে থাকায় নয়। নিক্রিয়তায় দেহের বিপাকক্রিয়ার গতি হয়ে পড়ে ধীর। শরীরে অতিরিক্ত ক্যালরি জমে, বাড়ে চর্বির পরিমাণ। যার পরিণতি মেদস্থূলতা, হৃদরোগ, উচ্চ কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস-সহ বিভিন্ন জীবনঘাতী রোগযন্ত্রণা।

এজন্যে গবেষকদের পরামর্শ-খাবার গ্রহণের পরপরই বসে বা শুয়ে পড়বেন না, তাতে রক্তে বাড়ে শর্করার পরিমাণ। বরং সচল থাকুন, তাতে রক্তের শর্করা-মান থাকবে আপনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

অনেকেরই ধারণা যে, বেশি খেলে ওজন বাড়ে আর খাওয়া কমিয়ে এ নিয়ন্ত্রণ করা যায় সহজেই। কিন্তু জেমস লেভিন বলছেন, ওজন নিয়ন্ত্রণে এর চেয়েও সহজতর ও কার্যকর পদ্ধতিটি হচ্ছে নিত্য সচল থাকা এবং যথাসম্ভব কম সময় বসে কাটানো। দিনে যখনই সুযোগ পাওয়া যায় তখনই একটু হেঁটে আসা-বাইরে কিংবা নিদেনপক্ষে ঘরেই হোক-হাঁটতে হাঁটতে আলাপ-আলোচনা এবং এ জাতীয় কাজগুলো সেরে নেয়া।

পাশ্চাত্যে সম্প্রতি এ ধারণাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই অফিস, কর্মক্ষেত্র, এমনকি স্কুলেও এর চর্চা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। কর্মীদের সুস্থতা নিশ্চিত করতে অফিস কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করছেন ট্রেডমিল ডেস্কের। স্কুলে শিক্ষার্থীরা গণিত আর বানানের ক্লাস করছে টুল-টেবিলহীন ক্লাসে কিংবা খেলাধুলা ও দৌড়ঝাঁপ করতে করতে। কোনো কোনো শহর-কর্তৃপক্ষ স্বল্প দূরত্বে গাড়ি ব্যবহার না করার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছেন নাগরিকদের। সংশ্লিষ্টরা জানাচ্ছেন, এর সার্বিক ফল হয়েছে বেশ চমৎকার। সুস্থতার হার বেড়েছে দৃশ্যমানভাবে।

তাই কোনো অজুহাতেই আর বসে থাকা নয়; আপনিও উঠে দাঁড়ান। হাঁটুন। সচল থাকুন। আপনার জীবন হোক গতিময় ও কর্মমুখর। সবদিক থেকেই আপনি সুস্থ থাকবেন। হয়ে উঠবেন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের এক প্রাণবন্ত উদাহরণ।

মিথ্যা তথ্যে
প্রাণ যাচ্ছে
মানুষের

মুনাফা বাড়ছে
ঔষধ কোম্পানির



বিশ্বের শীর্ষ কর্পোরেট অপরাধীদের তালিকায় ওপরের দিকের নামগুলো সব কাদের জানেন? বিখ্যাত সব ওষুধ কোম্পানির, যাদের তৈরিকৃত ও বাজারজাত করা ওষুধ আমরা পরম আস্থার সাথে হরহামেশাই সেবন করছি। দুঃখজনক হলেও সত্যি, গত কয়েক বছরে প্রতারণা-জালিয়াতির অভিযোগে হাজার হাজার কোটি ডলার জরিমানা গুণতে হয়েছে নামকরা এসব ওষুধ কোম্পানিকে। অবশ্য তাদের কাছে বিশাল অঙ্কের জরিমানাও প্রায় নসি, ব্যবসা চালু রাখার বাঁধা খরচ মাত্র।

ব্রিটিশ দৈনিক *দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট* এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওষুধের কাটতি বাড়তে ওষুধ কোম্পানিগুলো নিজেদের পণ্য সম্পর্কে ‘মিথ্যা তথ্য’ দিয়ে বিভ্রান্ত করছে চিকিৎসকদের। আর তা সেবন করে প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে কয়েক লাখ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে বলে সতর্ক করেছেন যুক্তরাজ্যের একদল চিকিৎসক।

যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও ন্যাশনাল ওবেসিটি ফোরামের উপদেষ্টা ডা. অসীম মালহোত্রা এবং রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট স্যার রিচার্ড থম্পসনসহ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকদের একটি দল ওষুধের প্রতিক্রিয়া ও কার্যকারিতা স্বাধীনভাবে তদন্ত করে দেখতে সে-দেশের পার্লামেন্টের পাবলিক একাউন্টস কমিটির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

অসীম মালহোত্রা বলেন, ওষুধ কোম্পানিগুলো তাদের ওষুধ নিয়ে চিকিৎসকদের যেসব তথ্য দেন তাতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। দেখা গেছে, কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকে অনেক ক্ষেত্রে ওষুধের কার্যকারিতা বাড়িয়ে বলা হয়েছে, সেইসাথে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথাও।

নতুন ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষার পর ভুল তথ্য নথিভুক্ত করা এবং তা মেডিকেল জার্নালে প্রকাশ করার প্রমাণও পাবলিক একাউন্টস কমিটি পেয়েছে বলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট-এর খবরে বলা হয়।

এর ফলে একদল চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে, যারা ওষুধ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্যটি জানেন না। যার মূলে রয়েছে রোগীর অধিকারকে গুরুত্ব না দিয়ে কর্পোরেট মুনাফা লাভের চেষ্টা। ইচ্ছাকৃতভাবে দেয়া এসব অস্বচ্ছ তথ্য রোগীদের মৃত্যু ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়চ্ছে জানিয়ে ডা. মালহোত্রা

যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের (এফডিএ) এক প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরেন।

এফডিএ-র ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসকদের পরামর্শে সেবন করা ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মৃত্যুর পরিমাণ এক লাখ ২৩ হাজার! এ-ছাড়া আরো ৮০ হাজারের বেশি মানুষ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে, যাদের অনেককেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। আক্রান্তদের কেউ কেউ পরে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে বলেও সাম্প্রতিক এ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। (অবশ্য মুনাফালোভী পুঁজিবাদীদের কাছে এ সংখ্যাটা নিতান্তই একটা পরিসংখ্যান বৈ কিছু নয়।)

এফডিএ-র প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে অসীম মালহোত্রা জানান, যুক্তরাষ্ট্রে গত এক দশকে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা তিনগুণ বেড়েছে। ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক অধ্যাপক পিটার গোটজের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যপ্রমাণ বলছে, হৃদরোগ ও ক্যান্সারের পরে যুক্তরাজ্যে তৃতীয় বৃহত্তম ঘাতক হচ্ছে ‘প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ’।

ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের এ বিশেষজ্ঞ বলেন, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন বয়স্ক নাগরিকরা। ৭৫ বছরের বেশি বয়সী, যাদের একাধিক ওষুধ খেতে হয়, তাদের মাথা ঝিমঝিম ও মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার জন্যে অন্যতম দায়ী জিনিসটি হলো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। এর ফলে তাদের কোমরে আঘাতসহ নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে।

আছে আরো অবাক করা তথ্য। প্রায় বছর দশেক আগে ইউরোপসহ মোটামুটি সারা বিশ্বজুড়েই সোয়াইন ফ্লু নিয়ে শুরু হয়েছিল ভীষণ উন্মাদনা। পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার কিছুদিন পরেই বিভিন্ন মহল থেকে জোরেশোরে প্রশ্ন উঠেছে—সোয়াইন ফ্লু ঠেকাতে যে উচ্চমূল্যের ভ্যাকসিনগুলো কেনা হয়েছিল তা কতটা যৌক্তিক ছিল।

৪৭টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের পার্লামেন্ট মেম্বররা তখনই প্রশ্ন তুলেছিলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সোয়াইন ফ্লু-কে প্যানডেমিক ডিজিজ (বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে এমন রোগ) হিসেবে ঘোষণা দিয়ে কেন বিভিন্ন দেশের সরকারকে এই ভ্যাকসিন কিনতে বাধ্য করেছে। কাউন্সিলের পার্লামেন্টারি এসেম্বলির ১৪টি সদস্য দেশ শুরু থেকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলোর দিকে। তাদের অভিযোগ, এ কোম্পানিগুলো তাদের ওষুধ ও ভ্যাকসিন

বিক্রির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে সরকারকে বিপদশঙ্কিত করে তুলেছিল।

ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করার এ ফন্দি বুঝতে পেরে সেসব দেশ তখনই সোয়াইন ফ্লু ওষুধ কেনার চুক্তি বাতিল করেছে। মূলত প্রাণসংহারী বার্ড ফ্লু বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকেই এসব ওষুধের ভ্যাকসিন কেনা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে জার্মান সাংসদ ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক সংসদীয় উপকমিটির প্রধান ওল্ফগ্যাং ওড্র্যাগ বলেন, বার্ড ফ্লু ও সোয়াইন ফ্লু নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে সতর্কতা জারি করেছে এর দুটোই মিথ্যা।

সোয়াইন ফ্লু যে সত্যিই প্যানডেমিক ডিজিজ হিসেবে দেখা দিতে পারে, এটা তার কাছে কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্যে বলেছে যে, এর পেছনে যে গোপন উদ্দেশ্য খোঁজা হচ্ছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এটা কোনো বাছবিচার বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই করা হয়েছে।

ওষুধ কোম্পানির অর্থায়নে হওয়া সব গবেষণাই ‘বিপণনমূলক’ অ্যাখ্যা দিয়ে ডা. মালহোত্রা বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল জার্নাল এবং চিকিৎসকরা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, আর্থিকভাবে লাভবান হতে ওষুধ কোম্পানিগুলোর এ চক্রান্তে জড়িয়ে গেছেন।’

এর প্রভাব থেকে বাঁচতে ‘তথ্যের স্বচ্ছতার’ ওপর গুরুত্ব দেন মালহোত্রা। পাশাপাশি ওষুধের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে কী হচ্ছে, তারও পরিষ্কার তথ্য থাকা দরকার বলে মনে করেন তিনি। কারণ তাতে ওষুধ কোম্পানির অর্থায়নে করা গবেষণার নৈতিক মান বাড়বে।

তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান, নিউ সায়েন্টিস্ট
বিডিনিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম



ধূমপান
ছাড়তে পারেন
আপনিও

ধূমপান নিয়ে বহুল প্রচলিত জোকসটা বোধহয় আমরা অনেকেই জানি— একটি সিগারেটের একপ্রান্তে থাকে আগুন আর অন্যপ্রান্তে থাকে একজন আহাম্মক!

না, এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য ধূমপায়ীদের হেয় করা নয়, বরং সবাইকে সচেতন করে তোলা। তাদের নিজের ও পরিবারের স্বার্থে, বৃহত্তর স্বার্থে তো বটেই। কারণ বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন ঘটে চলেছে অসংখ্য অকালমৃত্যু। এর মধ্যে এমন কারণও আছে যা এড়ানো অসম্ভব কিছু নয়, প্রয়োজন শুধু সচেতন প্রচেষ্টা। প্রতিরোধযোগ্য এসব মৃত্যুর প্রধান কারণ কিন্তু যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, এইডস কিংবা ক্যান্সার নয়। বরং এ রোগগুলোতে যত মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে তার চেয়ে ঢের বেশি অকালমৃত্যুর কারণ হলো নীরব মহামারী ধূমপান। বিশ্বজুড়ে দিন দিন অকালমৃত্যুর প্রধানতম কারণ হয়ে উঠছে এই ধূমপান।

একটি অনুসন্ধান মতে, বাংলাদেশে মোট জিডিপির এক শতাংশ খরচ হয় ধূমপানের পেছনে। বর্তমানে বিশ্বে প্রতিবছর ২০ লাখের অধিক লোক মারা যায় ধূমপানজনিত ক্যান্সারে। এর মধ্যে বাংলাদেশে মারা যায় বছরে ৫৭ হাজার। এক গবেষণায় জানা যায়, ধূমপান বন্ধ হলে বছরে নয় হাজার কোটি টাকা লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পাবে বাংলাদেশ। অন্যদিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রেহাই পাবে ধূমপানজনিত ক্যান্সারের হাত থেকে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে পরিমাণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তার ১২ গুণ বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ধূমপানের কারণে।

ধূমপান শুধু যে ধূমপায়ীর একার জন্যেই ক্ষতিকর তা নয়; বরং প্রত্যক্ষ ধূমপানের চেয়ে পরোক্ষ ধূমপান অনেক বেশি মাত্রায় ক্ষতিকর। আর সে ক্ষতি যে কত বহুমাত্রিক এবং প্রাণঘাতী হতে পারে তা এখন সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন। মানবদেহের প্রায় প্রতিটি সিস্টেমের ওপরই রয়েছে ধূমপানের স্বাস্থ্যঘাতী প্রভাব। ফুসফুস-সহ গোটা শ্বসনতন্ত্রের ওপর ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে প্রায় সবাই এখন জানেন।

কিন্তু ধূমপানের ক্ষতি শুধু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। বিশেষত হৃদযন্ত্রের ওপর এর ক্ষতির পরিমাণ সীমাহীন। কারণ সিগারেটে থাকা নিকোটিন

হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীকে ক্রমাগত সংকুচিত করে তোলে এবং বলা হয়ে থাকে যে, যাদের করোনারি হৃদরোগ রয়েছে তাদের আকস্মিক হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর জন্যে কখনো কখনো একটি সিগারেটই যথেষ্ট। আর ধূমপায়ীদের হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর আশঙ্কা অধূমপায়ীদের চেয়ে এমনিতেই ছয় গুণ বেশি।

ধূমপায়ীরা কি জানেন, সিগারেট ফুঁকে লম্বা সুখটানে তারা কী টেনে নিচ্ছেন? উত্তর হলো, প্রায় চার হাজার রকমের রাসায়নিক উপাদান। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এর সবই স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদে মানবদেহের জন্যে বিষাক্ত। তাই ‘সুখটানে বিষপান’ কথাটি সত্য বটে।

এ-ছাড়াও ধূমপানের ফলে শরীরের জন্যে উপকারী এইচডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমতে থাকে। ধূমপায়ীরা এভাবে শুধু নিজের ক্ষতিই করছেন না, বরং পরোক্ষভাবে স্ত্রী-সন্তানসহ পরিবারের সদস্য এবং পরিবেশের ক্ষতিও করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

ধূমপানের স্বাস্থ্যঘাতী দিকগুলো সম্বন্ধে এখন আধুনিক মানুষ মাত্রই সচেতন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আমাদের চারপাশের মানুষের-বিশেষত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে এ নিয়ে সচেতনতার প্রয়োজন আছে আরো। নিজেদের সন্তানদের সুস্থতার জন্যে ধূমপায়ীদের জানতে হবে বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ সাবধানবাণী; তা হলো—

ধূমপান শুধু ধূমপায়ীরই ক্ষতি করে না, বরং পরোক্ষভাবে অধূমপায়ীদের জীবনকেও দীর্ঘমেয়াদে করে তোলে ঝুঁকিপূর্ণ। বিশ্বজুড়ে ফুসফুসের ক্যান্সারের অন্যতম কারণ হলো পরোক্ষ ধূমপান। ধূমপায়ীদের অজ্ঞতার ফলে এভাবেই তার চারপাশের মানুষের জীবনও হয়ে ওঠে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল বলছে, ধূমপায়ী মা-বাবার সন্তানেরা উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হয়।

টাইম সাময়িকীর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, যেসব শিশু স্কুলে যাওয়ার বয়স হওয়ার আগেই বাবা-মায়ের পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়, তাদের উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অধূমপায়ী বাবা-মায়ের সন্তানদের তুলনায় শতকরা ২১ ভাগ বেশি।

তারা বলেন, এটি আসলেই মারাত্মক। কারণ এসব শিশু সারাজীবন ধরে উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বয়ে বেড়ায়। সেইসাথে থাকে স্ট্রোক ও হৃদরোগের মতো প্রাণঘাতী রোগের শঙ্কা। আর শৈশব থেকেই

যারা এমন বাড়তি রক্তচাপে ভোগে, পরবর্তীতে তাদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি এমনিতেই অনেক বেশি। শুধু এমন পরোক্ষ ধূমপানের কারণেই যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে হৃদরোগীর সংখ্যা প্রায় ২৭ মিলিয়ন। তাই ধূমপানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হতে হবে এখনই।

ধূমপানে বার্ষিক্য আসে দ্রুত। ২০১৩ সালে রয়টার্সের একটি রিপোর্টে বলা হয়, একজন ধূমপায়ী ও আরেকজন অধূমপায়ী, এমন ৭৯ জোড়া যমজের ওপর যুক্তরাষ্ট্রে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। চূড়ান্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে সে-দেশের ত্বক-চিকিৎসক ও কসমেটিক লেজার বিশেষজ্ঞ এলিজাবেথ তানজি বলেন, এসব জোড়ায় পরস্পরের মধ্যে জিনগত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায় একইরকম হলেও ধূমপায়ীদের দেখাচ্ছিল অপেক্ষাকৃত বার্ষিক্যপীড়িত এবং ওদের চেহারাও বার্ষিক্যের ছাপ ছিল স্পষ্ট।

তামাক তথা ধূমপানের এ সমস্ত ক্ষতি বিবেচনায় বিশ্বজুড়ে এখন এর সমাধানের উপায় খোঁজা হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় সবকটি দেশেই এখন এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তার অন্ত নেই।

২০০৮ সালে নিউইয়র্ক সিটির তৎকালীন মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় নিউজউইক সাময়িকীর প্রিন্ট সংস্করণে। দ্য ওয়ে টু সেভ মিলিয়নস অব লাইভস ইজ টু প্রিভেন্ট স্মোকিং শীর্ষক এ নিবন্ধটিতে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন—‘খোদ আমেরিকাতেই প্রতিদিন গড়ে ১৪০০ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে শুধু ধূমপানের কারণে। আমরা যদি এখনই কোনো পদক্ষেপ না নিই, তাহলে এ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে গিয়ে এ সংখ্যা দাঁড়াবে এক বিলিয়নে।’

তিনি আরো বলেন, ‘২০০২ সালে আমি কর্মক্ষেত্রে ধূমপান নিষিদ্ধকরণ আইনে স্বাক্ষর করি। ব্যাপক হইচই সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ কিন্তু এজেন্সি আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়। কারণ এর ফলে সবখানে কাজের চমৎকার পরিবেশ গড়ে উঠেছে এবং রেস্টুরেন্টগুলোতেও ব্যবসা বেড়ে যায় বলে তারা আমাকে জানান। এর কিছুদিনের মধ্যেই ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি, আয়ারল্যান্ডেও এ আইনের প্রয়োগ শুরু হয়।

পাশাপাশি সিগারেটের ওপর ট্যাক্স বাড়ানো হয় এবং ধূমপান বিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ফলে দেখা গেছে, ওখানে ধূমপানের হার কমে গেছে শতকরা ২১ ভাগ। আর কিশোর ধূমপায়ীর সংখ্যা নেমে এসেছে অর্ধেক। অথচ ছয় বছর আগে ২০০২ সালে নিউইয়র্কে ধূমপায়ীর সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ।’

নিউইয়র্ক ও অন্যান্য উন্নত দেশগুলোতে যখন ধূমপায়ীর সংখ্যা কমানোর এই নিরন্তর চেষ্টা অব্যাহত, তখন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্রমশ ধূমপানের কারণে বেড়ে চলেছে মানবসম্পদ ও সম্ভাবনার নির্মম অপচয়। বলা হচ্ছে, আগামী কয়েক দশকে ধূমপানজনিত কারণে মৃত্যুর ৮০ শতাংশই ঘটবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টিতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয়, সে তুলনায় এ-ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ নেই বললেই চলে।

ধূমপানের কারণে ধৈয়ে আসা নিশ্চিত বিপর্যয় এড়াতে বিল এন্ড মেলিভা গেটস ফাউন্ডেশন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে একযোগে কাজ শুরু করেন মেয়র ব্রুমবার্গ। যার প্রেক্ষিতে ছয়টি কর্মকৌশল নির্ধারণও করেন তারা।

প্রথমত, তামাকের বিস্তার ও এর বহুবিধ ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করা। কারণ সমাধানের পথ খুঁজে পেতে হলে আগে সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে হবে আপনাকে।

দ্বিতীয়ত, পরীক্ষা ধূমপান থেকে মানুষকে রক্ষা করা এবং এর একমাত্র উপায় হলো কর্মক্ষেত্রে ধূমপান নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে তামাকমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা, যা ইতোমধ্যে নিউইয়র্কে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

তৃতীয়ত, ধূমপান থেকে বেরিয়ে আসতে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে মানুষকে সাহায্য করা।

চতুর্থত, জোরালো প্রচারণার মাধ্যমে মানুষকে ধূমপানের কুফল সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা।

পঞ্চমত, তামাকের সমস্ত বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও স্পন্সরশিপ নিষিদ্ধ করা। এ থেকে সাশ্রয় হতে পারে বিপুল অর্থ, যা তামাক শিল্পগুলো সিগারেটের বিজ্ঞাপনে খরচ করে।

ষষ্ঠত, তামাকের কর বাড়ানো। বিশেষত তরুণদের মাঝে ধূমপান নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধে এ পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর। ধূমপান নিরুৎসাহিতকরণের পাশাপাশি এটি রাজস্বখাতেও প্রচুর অর্থের যোগান দেবে, যা ধূমপান বিরোধী প্রচারণায় কাজে লাগানো সম্ভব।

অনেক দেশই এই কর্মকৌশলগুলো বাস্তবায়নের জন্যে ধাপে ধাপে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইতোমধ্যে মেক্সিকো, তুরস্ক ও চীন সরকার এর প্রয়োগ শুরু করেছে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া সরকারও ধূমপানের ফলে ক্রমশ ধৈয়ে আসা মহামারি ঠেকাতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

সংশয়বাদীদের ধারণা-ধূমপান আমাদের জীবনযাপনের সংস্কৃতির এত গভীরে ঢুকে গেছে যে, এর মূলোৎপাটন সহজ নয়। কিন্তু এ-ও সত্য-মানুষ যখন যা চেয়েছে তা-ই সম্ভব হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংস্থাগুলো ও সরকারসহ আমরা সবাই সজ্জবদ্ধভাবে কাজ শুরু করলে ধূমপানজনিত অসংখ্য অকালমৃত্যুর হার রোধ করা সম্ভব। আর ধূমপানের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলাটাই এখন বিশ্বজুড়ে অকালমৃত্যু ঠেকানোর অন্যতম উপায়। তাতে বেঁচে যাবে লক্ষ কোটি সম্ভাবনাময় প্রাণ।

এ-তো গেল আঞ্চলিক বা বৈশ্বিক পর্যায়ে কথা। ব্যক্তিপর্যায়ে আপনি কী করতে পারেন? আপনার ব্যক্তিগত সচেতনতা সামান্য হলেও ভূমিকা রাখতে পারে বিশ্বের পট পরিবর্তনে। আপনি যদি ধূমপায়ী হয়ে থাকেন তবে ধূমপান ত্যাগের মধ্য দিয়ে শুরু হতে পারে এ পরিবর্তনের সূচনা।

অনেকে বলেন, ‘ধূমপান ছেড়ে দেয়া খুব সহজ। কতবার ছাড়লাম! কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতেই আবার ধরে ফেলি-সমস্যাটা সেখানেই!’ বাস্তবতা হলো-আপনি চাইলে জীবনের তরে ধূমপান ছেড়ে দিতে পারেন। শুধু আপনার ইচ্ছাশক্তিই এজন্যে যথেষ্ট।

ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্যে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে পারেন আপনি। যেমন : আজকের পর থেকে ধূমপানকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করুন। তাই যখনই ধূমপান করতে ইচ্ছে হবে তখন সব কাজ বাদ দিয়ে আপনি ধূমপানের জন্যেই সময় বরাদ্দ করুন। সচেতন হোন কখন আপনি ধূমপান করেন। গল্প করতে করতে বা টিভি দেখতে দেখতে, হাঁটতে হাঁটতে কিংবা কোনো কাজ করতে করতে ধূমপান করবেন না।

ধূমপানের সময় পুরোটা মনোযোগ নিবদ্ধ করুন আপনার কাজটিতে। চোখ বন্ধ করে সুখটান দিন, কল্পনার চোখে দেখুন, সিগারেটের ধোঁয়া আপনার নাক দিয়ে শ্বাসনালী অতিক্রম করে ফুসফুসের ভেতরে প্রবেশ করছে। এবার অনুভব করুন-ধোঁয়াটা ক্রমশ একটি সাপের আকার নিচ্ছে এবং এ সাপটি ফুসফুসে গিয়ে ছোবল মারছে আর প্রতিটি ছোবলের সাথে ঢেলে দিচ্ছে নিকোটিন নামের বিষ।

অনুভব করতে চেষ্টা করুন-বিষাক্ত ছোবলে আপনার ফুসফুস যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। অনুভূতি না এলে বাস্তবে যন্ত্রণার অভিনয় করুন। পরের টান দিয়ে আবার একই অনুভূতি আনার চেষ্টা করুন। পুরো একটা সিগারেট শেষ করে আপনি আপনার অনুভূতি ডায়েরিতে লিখে রাখুন। এভাবে

একদিন, দুই দিন, তিন দিন, বড়জোর এক সপ্তাহ; একসময় দেখবেন আপনার শরীর সিগারেট প্রত্যাখ্যান করবে। ধূমপান বর্জনের এটি অত্যন্ত পরীক্ষিত ও ফলপ্রসূ প্রক্রিয়া। গত দু-যুগে বহু মানুষ এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ধূমপানের মতো আত্মঘাতী অভ্যাস থেকে মুক্ত হয়েছেন।

এ-ছাড়াও মেডিটেশনের মাধ্যমে সিগারেট ছাড়তে পারেন আপনি। নিয়মিত মেডিটেশন বা ধ্যান করলে মনের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সহজ হবে, জাগ্রত হবে আপনার ইতিবাচক শক্তি। তখন যে-কোনো কাজ অনুসরণ বা বর্জন আপনার জন্যে হয়ে উঠবে অনেক সহজ।

সর্বগ্রাসী ধূমপান আসক্তি থেকে চিরতরে মুক্ত হওয়ার সংকল্পে আপনি এখন বদ্ধপরিকর। আপনি পারবেনই। আপনাকে আমাদের আগাম অভিনন্দন!

তথ্যসূত্র : টাইম, ২৪ জানুয়ারি ২০১১
নিউজউইক, সেপ্টেম্বর ২০০৮
সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড

যখন অভ্যাসের ওপর
শুধু আপনারই নিয়ন্ত্রণ থাকবে,
তখনই আপনি অর্জন করবেন
সত্যিকার স্বাধীনতা।

সঠিক
জীবনদৃষ্টি
ও যত্নায়ন

দেহ-মনকে
স্ট্রেস ও টক্সিনমুক্ত করে



যত্নায়ন। কোয়ান্টাম পরিভাষায় এ শব্দটির অর্থ হলো, দেহ-মনের সুস্থতা ও প্রশান্তির জন্যে যথাযথ মনোযোগ ও বিজ্ঞানসম্মত যত্ন। আমাদের সার্বিক সুস্বাস্থ্যের জন্যে এটি হতে পারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর একটি অনুশীলন। দৈনন্দিন জীবনযাপনে নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সচেতন-অসচেতনভাবে আমাদের দেহ-অভ্যন্তরে এবং মনের গভীরে নানা রকম স্ট্রেস ও টক্সিন বা বিষাক্ত সৃষ্টি হয়, যা আমরা বের করে দিতে পারি এই যত্নায়নের মাধ্যমে। যত কার্যকরভাবে এটা আমরা করতে পারব ততই বাড়বে আমাদের সুস্থতার শক্তি ও প্রশান্তির স্থায়িত্ব।

যত্নায়নের রয়েছে পাঁচটি ধাপ :

দম : যত্নায়নের প্রথম ধাপটি হচ্ছে দম। সঠিকভাবে দম নেয়া ও ছাড়ার মাধ্যমে আমরা দেহকে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডমুক্ত করতে পারি। তাই দম যত সঠিক হবে তত আমাদের এনার্জি লেভেল বাড়তে থাকবে। সারাদিন পরিশ্রম করেও দেহ থাকবে ক্লান্তিহীন ও কর্মক্ষম। এজন্যে দিনে অন্তত পাঁচ বার উজ্জীবন বা বিশেষ নিয়মে বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার অভ্যাস করুন। দিন কয়েকের মধ্যে একটা চনমনে পরিবর্তন নিজেই অনুভব করবেন।

সঠিক খাদ্যাভ্যাস : যত্নায়নের দ্বিতীয় ধাপে সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। কারণ খাবারের মধ্য দিয়ে যাতে দেহে টক্সিন প্রবেশ না করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। তাই সবসময় রাসায়নিকমুক্ত প্রাকৃতিক ও তাজা খাবার এবং মৌসুমি ফলমূল খেতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে একটাই-স্বাস্থ্যের জন্যে যা ভালো সেটাই খাব। আর টক্সিনযুক্ত খাবার ও পানীয়, যেমন : সব ধরনের প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাত খাবার, অতিরিক্ত তৈলাক্ত-ভাজাপোড়া ও অধিক চিনিযুক্ত খাবার, এলকোহল, কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস, ধূমপান অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

ব্যায়াম : এটি যত্নায়নের তৃতীয় ধাপ। আর সব ধরনের ব্যায়ামের মধ্যে সবচেয়ে সহজ, আধুনিক ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন ব্যায়াম হচ্ছে কোয়ান্টাম ব্যায়াম। যা আমাদের শরীরের হরমোনা, বায়ো-ইলেক্ট্রিক্যাল ও নার্ভাস

সিস্টেমসহ দেহের সবগুলো সিস্টেমের মধ্যে আন্তঃপারস্পরিক ভারসাম্য বজায় রাখে দারুণভাবে। এর পাশাপাশি প্রতিদিন (সপ্তাহে ন্যূনতম পাঁচ দিন) ২০ থেকে ২৫ মিনিট হাঁটা সুস্থতার জন্যে অত্যন্ত সহায়ক। সুস্বাস্থ্যের জন্যে হাঁটা ও ব্যায়ামের বহু রকম উপকার তো আছেই, এ-ছাড়াও এতে ঘামরূপে ত্বকের মধ্য দিয়ে অনেক ক্ষতিকর টক্সিন দূরীভূত হয়ে যায়।

হজম : যত্নায়নের চতুর্থ ধাপে রয়েছে হজম। প্রথমত, এর জন্যে আমাদের খাবারটাই এমন সুপাচ্য হওয়া উচিত যেন সহজে হজম হয়। দ্বিতীয়ত, খাবার গ্রহণের পরিমাণ। এ ব্যাপারে নবীজী (স)-এর শিক্ষা হচ্ছে, খাওয়ার সময় পাকস্থলীর এক তৃতীয়াংশ শক্ত খাবার, এক তৃতীয়াংশ তরল এবং এক তৃতীয়াংশ ফাঁকা রাখো। অর্থাৎ একটু ক্ষুধাভাব থাকতেই খাওয়া শেষ করা। পরিপাকতন্ত্র বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘ গবেষণায় দেখা গেছে, এমন খাদ্যাভ্যাসে হজম ভালো হয়।

রেচন : রেচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্রাব-পায়খানার সাথে শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন নির্গত হয়। সুস্থতার জন্যে এসব বর্জ্য পদার্থ প্রতিদিন বেরিয়ে যাওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে দেহের সার্বিক পরিচ্ছন্নতাও সুন্দরভাবে বজায় থাকে। সহজপাচ্য খাবার, ব্যায়াম ও হাঁটা সুরেচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

এসবের পাশাপাশি সুস্থতার জন্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার কোনো বিকল্প নেই। নিয়মিত গোসল করার মধ্য দিয়েও শরীর থেকে বহু ধরনের টক্সিন বেরিয়ে যায়। রসুলুল্লাহ (স)-এর শিক্ষারও একটা বড় অংশ হচ্ছে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে তিনি ঈমানের অর্ধেক হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আমরা আসলে অধিকাংশ সময়ই সুস্থ থাকি। অসুস্থ হই কখনো কখনো। আমাদের ৭৫ ভাগ রোগের কারণ হলো শরীরের ভেতরে সৃষ্টি হওয়া টক্সিন-যার উৎস হতে পারে নেতিচিন্তা, অস্বাস্থ্যকর খাবার, অসুস্থ বিনোদন, মাত্রাতিরিক্ত আবেগীয় সম্পর্ক ও শখ, ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি ইত্যাদি। বাকি ২৫ ভাগ রোগের কারণ হতে পারে ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসজনিত, যথাযথ পুষ্টির অভাব ও ভুল ওষুধ বা সার্জারির জটিলতা।

সাধারণত দুভাবে আমরা এ বিষাগুতে আক্রান্ত হতে পারি। প্রথমত, মন অসুস্থ হলে টক্সিন তৈরি হতে পারে। যেমন : দুশ্চিন্তা রাগ ক্ষোভ ঘৃণা ঈর্ষা গীবত থেকে টক্সিন সৃষ্টি হতে পারে। আবার বস্তুগত কোনো অস্তিত্ব নেই এমন কিছু অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গিগত ভুল থেকেও টক্সিন সৃষ্টি হতে পারে।

তথাকথিত বিনোদনের ফলেও দেহ-মনে স্ট্রেস ও টক্সিন সৃষ্টি হতে পারে। যেমন : টিভিতে অধিকাংশ সময়ই আমরা দেখছি ভায়োলেস হিংসা সন্ত্রাস মারামারি চক্রান্ত ষড়যন্ত্র পরকীয়া। টিভিতে দেখা এসব ঘটনা এবং চরিত্র আমাদেরকে নেতিবাচকভাবে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। বাস্তব জীবনেও অবচেতনভাবে প্রলুব্ধ করে এসব ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে। ফলে আমাদের ভেতরে সৃষ্টি হয় টেনশন হতাশা আসক্তি আর অন্তর্দ্বন্দ্ব। এসব থেকেও দেহের ভেতরে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ টক্সিন।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন কারণেও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে আমাদের শরীরে টক্সিন প্রবেশ করতে পারে নানাভাবে। যেমন : আমরা এখন প্রতিনিয়ত টিভি, মোবাইল ও স্মার্টফোনসহ ঘরে-বাইরে ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের রেডিয়েশনের সম্মুখীন হচ্ছি। মোবাইল টাওয়ার থেকে প্রতিনিয়ত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ক্ষতিকর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রশ্মি। বিজ্ঞানীরা একে বলছেন ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্টর্ম, যা মানবদেহের জন্যে ক্ষতিকর এমনকি প্রাণঘাতীও হতে পারে।

আর আধুনিককালে টক্সিন সৃষ্টি হওয়ার একটা বড় মাধ্যম হলো মোবাইল ফোন বিশেষত স্মার্টফোন। মোবাইল-নির্ভরতা বেড়ে যাওয়ায় একাগ্রভাবে বসে কোনো কাজ করা এখন আর সম্ভব হয় না। সময়ে-অসময়ে বার বার ফোনকল আসায় অনিচ্ছায় হলেও আমরা সেটা রিসিভ করি, কিন্তু বিরক্তি নিয়ে। এই বিরক্তির উদ্বেক হওয়াতেও আমাদের ভেতরে টক্সিন সৃষ্টি হচ্ছে।

আমরা লক্ষ করলে দেখব, দেহে টক্সিন বেশি হলে এসিডিটি বেড়ে যায়। এসিডিক অবস্থার বিপরীত হচ্ছে এলকালাইন অবস্থা। এলকালাইন হচ্ছে দেহের এমন এক অবস্থা যখন আমরা প্রশান্ত থাকি, সুস্থ থাকি। আর দেহকে সবসময় এই এলকালাইন অবস্থায় রাখার জন্যেই প্রয়োজন মেডিটেশন। এলকালাইন বা প্রশান্ত অবস্থা একজন মানুষকে স্ট্রেস ও টক্সিনসৃষ্টি ৭৫ ভাগ রোগ থেকে মুক্ত রাখতে পারে।

সুস্থ থাকার জন্যে সঠিক যত্নায়নের সাথে সাথে নিরাময়ের আরো চারটি শাস্ত্রত উপায় হলো ধ্যান, দোয়া, দান এবং দাওয়া। মন স্থির না হলে, মনে প্রশান্তি না এলে দেহে প্রশান্তি আসবে না। কখনো সুস্থতা আসবে না। ধ্যান বা মেডিটেশন আমাদের অন্তরে এই প্রশান্তি নিয়ে আসে। আর ধ্যানের পাশাপাশি নিরাময় প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজন দোয়া বা হিলিং। কারণ আন্তরিক প্রার্থনা নিরাময় প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে।

রোগ নিরাময়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে সদকা বা দান। যারা নিয়মিত দান করেন তাদের জীবনে বিপদ যদি আসে তুফানের মতো তবে চলে যায় বৃদ্ধবৃদ্ধের মতো। সৎ দানের বিনিময়ে স্রষ্টা মানুষকে অনেক বিপদ ও বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করেন। চিকিৎসায় যে পরিমাণ অর্থ খরচ হতে পারে অসুস্থ হওয়ার আগে অর্থাৎ সুস্থ থাকতেই সে অনুপাতে আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করা যেতে পারে।

৭৫ ভাগ রোগ নিরাময়ের জন্যে ধ্যান, দোয়া ও দান-এই তিনটিই যথেষ্ট। বাকি ২৫ ভাগের জন্যে প্রয়োজন সঠিক চিকিৎসা বা দাওয়া। নিরাময়ের জন্যে ওষুধের সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দাওয়া বা পথ্য।

শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং আত্মিক-জীবনের এই প্রতিটি দিকেই ভালো থাকার নাম হচ্ছে সুস্থতা। সুস্থ জীবনযাপনের জন্যে বিশেষ জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন হয় না, বরং প্রয়োজন জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির। আর এজন্যে স্রষ্টা আমাদেরকে যে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি দিয়েছেন এটি প্রয়োগ করাই যথেষ্ট। তাই আমরা বলতে পারি, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিপূর্ণ যত্নায়ন দেহ-মনকে স্ট্রেস ও টক্সিনমুক্ত করে। রাখে সুস্থ ও কর্মচঞ্চল।

তথ্যসূত্র : কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত হিলিং ওয়ার্কশপে (১ মে ২০১৩)
গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের আলোচনার নির্বাচিত অংশ

পারিবারিক ও
সামাজিক বন্ধন

আপনাকে রাখবে

সুস্থ
প্রাণবন্ত
কর্মোদ্যমী



যুথবদ্ধতাই শক্তি

মানুষ একা নয়। কোনো না কোনোভাবে সে একত্রিত ও যুথবদ্ধ। পরিবারমুখিতা মানুষের চিরায়ত ও সহজাত প্রকৃতি। এ-ছাড়াও জীবনের পরতে পরতে বিভিন্ন উপলক্ষে সে ক্রমশ যুক্ত হতে থাকে নানা সামাজিক বন্ধনে। এসব সম্পর্কের গাঁথুনি যার জীবনে যতটা সুনিবিড় ও দৃঢ়, জীবনটাও তার কাছে ততটা উপভোগ্য ও সহজ। সমাজতাত্ত্বিকদের পর্যবেক্ষণে এ আজ এক সার্বজনীন সত্য।

কিন্তু শুধু অভিজ্ঞতা-পর্যবেক্ষণে সন্তুষ্ট নন একবিংশ শতকের বিজ্ঞানীকূল। তাদের চাই প্রমাণ, চাই শক্ত্যপোক্ত তথ্য-উপাত্ত। যার হৃদিস মিললেই কেবল তারা এর পক্ষে রায় দেন। ঠিক তেমনই কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিচালিত হয়েছে বিশ্বজুড়ে খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে।

আর এ গবেষণার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা বলছেন, সুসম পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনে যারা বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পান, তারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু হন। আসল রহস্যটা এসব মানুষের দৈনন্দিন জীবনচালা-এদের খাদ্যাভ্যাস তুলনামূলক স্বাস্থ্যকর, এরা কমবেশি নিয়মিত ব্যায়াম করেন। সবমিলিয়ে তাদের জীবনধারা অনেকটাই সুস্থ। মানসিক দিক থেকেও তারা অধিকতর সক্ষম। কারণ তাদের গভীর বিশ্বাস-আসুক যতই কঠিন সময়, কেউ না কেউ পাশে এসে ঠিক দাঁড়াবেই।

পরিবার চিরসত্য, চিরসুন্দর ॥ পারিবারিক বন্ধনে বাড়ে আয়ু

পারিবারিক একাত্মতা জীবনকে সুন্দর করে। করে তোলে অর্থবহ। বিজ্ঞানীরা রীতিমতো জোর দিয়ে বলছেন, পারিবারিক সম্প্রীতির সাথে মানুষের দীর্ঘায়ু অর্জনের সম্পর্কটা একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত। তাদের মতে, বাবা-মা, সন্তান ও ভাইবোনদের সাথে কাটানো আনন্দঘন মুহূর্ত দীর্ঘায়ু লাভে বিশেষভাবে সহায়ক। কিন্তু পারিবারিক বন্ধন যাদের দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে উল্টোটা।

পারিবারিক একাত্মতার সুফল মানুষ পেতে শুরু করে জীবনের গোড়া থেকেই। যেসব পরিবারে বাবা-মা ও সন্তানদের মাঝে উষ্ণ সম্পর্ক বিরাজমান, ক্যাসারের মতো অসুখে পড়ার সম্ভাবনা তাদের কম। এবং এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যেসব পরিবারে একত্রে খাওয়াদাওয়ার রীতি চালু আছে, তারা তুলনামূলক সুস্থ খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত। সাম্প্রতিক আরেকটি গবেষণায় বলা হয়েছে, এসব পরিবারের শিশুরা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম।

৫৭ থেকে ৮৫ বছর বয়সী তিন হাজার মানুষের ওপর ২০১৬ সালে পরিচালিত হয় একটি বড় আকারের গবেষণা। যার ফলাফল উপস্থাপন করা হয় আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায়। তাতে বলা হয়েছে, এই প্রবীণদের মধ্যে যারা তাদের পরিবারের সদস্য ও আপনজনদের প্রতি গভীর সখ্যতা অনুভব করেন, তাদের মৃত্যুঝুঁকি পরবর্তী পাঁচ বছরে নেমে আসে ছয় শতাংশে। যারা একান্ত সম্পর্কগুলোতে উষ্ণতা খুঁজে পান না, তাদের ক্ষেত্রে এ ঝুঁকি বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ শতাংশ।

গবেষকরা মনে করছেন, পরিবারের সদস্য ও প্রিয়জনদের প্রতি দায়িত্ববোধই এসব মানুষকে দীর্ঘজীবন লাভের ব্যাপারে আশাবাদী ও অনুপ্রাণিত করে তোলে। টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডালা-লানা স্কুল অব পাবলিক হেলথের পোস্ট ডক্টরাল গবেষক জেমস ইভেন্যুক বলেন, তাই আমাদের উচিত পরিবারের সদস্য-স্বজনদের সাথে আরো একাত্মতা বাড়ানো, কখনোই একে অন্যকে এড়িয়ে চলা নয়।

ভাইবোনে হৃদয়তা ॥ বাড়ায় তৃপ্তি ও আনন্দ কমায় উদ্বেগ, বিষণ্ণতা

আপনি ভালো আছেন, সুস্থ সুন্দর আনন্দময় জীবনযাপন করছেন, এর কিছু কৃতিত্ব দিতে হবে আপনার ভাইবোনদেরও। ভাইবোনের সাথে সম্পর্কটা যাদের মধুর, তারা দৈহিকভাবে তুলনামূলক সুস্থ এবং মানসিক দিক থেকেও প্রজ্ঞাপূর্ণ জীবনযাপন করেন। এমনটাই মত গবেষকদের।

২০১৫-তে ২৪৬টি পরিবারের সন্তানদের নিয়ে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ভাইবোনের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে যারা যতটা ইতিবাচক ও একাত্ম, বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হওয়ার হার ওদের ততটাই কম।

আরেকটি গবেষণায় বলা হয়েছে, বিশেষত বোনদের সাথে একাত্মতা রয়েছে যাদের—একাকিত্ব, ভালবাসাহীনতা, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, উদ্বেগ, এমনকি ভয়ের মতো নেতিবাচক অনুভূতির আত্মসন তাদের জীবনে অনেক কম। আর বয়স এতে কোনো বাধা নয়। কারণ পরিণত বয়সের সুসম্পর্কধারী ভাইবোনদের নিয়ে পরিচালিত গবেষণাতেও দেখা গেছে, তারা অপেক্ষাকৃত সুখী ও আনন্দময় জীবনযাপন করেন। এ-ছাড়াও নিজেদের পাশাপাশি অন্য আত্মীয়স্বজনদের সাথেও বজায় থাকে তাদের সম্পর্কের উষ্ণতা।

দাম্পত্য সুসম্পর্কে প্রাপ্তি অশেষ

আপনার দাম্পত্যসঙ্গী অর্থাৎ স্বামী/ স্ত্রীর সাথে উষ্ণ ভাব-বিনিময় ও কথোপকথন আপনাদের সম্পর্কটাকে গভীর আর মজবুত করে তো বটেই, সেইসাথে রাখে সুস্থ, বাড়ায় দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা।

২০১৭ সালে ১৬২টি যুগলের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, তাদের পারস্পরিক আলাপনটা যেদিন সুখপ্রদ ও ইতিবাচক ছিল, সেদিন তারা একাকিত্বে ভুগেছেন কম, অনুভব করেছেন অধিকতর হৃদ্যতা এবং ব্যায়াম করার ব্যাপারে ছিলেন তুলনামূলক বেশি আগ্রহী। অন্যদিনের তুলনায় তাদের ঘুমটাও সেদিন হয়েছে বেশ ভালো।

এ প্রসঙ্গে ওয়াশিংটনের গনজাগা ইউনিভার্সিটির সাইকোলজিস্ট সারাহ অ্যারপিন বলেন, আপনার দৈনন্দিন জীবনের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা-অনুভূতি ও সুখবরগুলো যখন আপনি দাম্পত্যসঙ্গীর সাথে শেয়ার করেন, তখন নিশ্চিতভাবেই এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে আপনার স্বাস্থ্যেও।

পারিবারিক ও সামাজিক একাত্মতা দেয় সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

বিশ্বজুড়ে আধুনিক ধারার সমাজবিজ্ঞানী এবং স্বাস্থ্য-গবেষকদের সাম্প্রতিক গবেষণার ভিত্তিতে এটা আজ এক প্রমাণিত সত্য যে, পারিবারিক ও সামাজিক একাত্মতা একজন মানুষকে সুস্থ সুখী সফল জীবনের পথে চালিত করে। তাই আমাদেরও উচিত এ যুথবদ্ধ জীবনযাপনের প্রতিটি সুযোগকেই কাজে লাগানো। এবং প্রয়োজন আমাদের উত্তরপ্রজন্মকেও সাধ্যমতো এমন জীবনধারায় অভ্যস্ত করে তোলা।

তাই যে-কোনো বিষয়ে পারিবারিক আলোচনা, পরিবারের সবাই অন্তত

একবেলা একসাথে খাওয়া ইত্যাদি আচরণ-অভ্যাসের পাশাপাশি সজ্জবদ্ধভাবে নৈতিকতার চর্চায়ও মনোযোগী হোন। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে সাদাকায়ন-আলোকায়নসহ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিন। সেখানে অন্যদের সাথে পরিচিত হোন, পরিবারের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিন। সপ্তাহে অন্তত একদিন পরিবারে ধর্মবাণী পাঠ ও আলোচনার ব্যবস্থা করুন।

সুখম পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আপনার ও আপনার পরিবারের সদস্য এবং প্রিয়জনদের পরিচালিত করুক সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের পথে।

তথ্যসূত্র : টাইম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

শরীরের বিভিন্ন জটিল রোগ
প্রেম, মমতা বা আত্মিক চেতনা বর্জিত
জীবনেরই বহিঃপ্রকাশ।
সুস্থ জীবনদৃষ্টি দেহ-মনে
ভারসাম্য এনে রোগ নিরাময় করে।

পরিবারে
সালামের চর্চা
বাড়াবে
শান্তি সুখ
সমমর্মিতা

আসসালামু
আলাইকুম
বাবা

ওয়া
আলাইকুম
আস-সালাম



সামাজিক পরিমণ্ডলে, কর্মক্ষেত্রে, রাস্তাঘাটে কারো সাথে দেখা হলে আমরা প্রথমত সালাম দেই। সাধারণভাবে কুশল বিনিময় শুরুই হয় সালাম বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। ‘আসসালামু আলাইকুম’ কথাটির অর্থ হলো, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। কিন্তু পারস্পরিক সুখ-শান্তি-সাফল্য কামনার এ শুভচর্চা আমাদের পরিবারগুলোতে কতটা হয়?

অথচ একটি সুখী মমতাময় পারিবারিক আবহ সৃষ্টির জন্যে এক অনবদ্য উপায় হতে পারে এই কল্যাণ কামনা। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সালাম বিনিময় হতে পারে একটি সুন্দর পারিবারিক সংস্কৃতি।

আবহমান কাল ধরে প্রাচ্যের, বিশেষত আমাদের একটি বড় গর্বের বিষয় আমাদের পরিবার। স্থূল ভোগবাদী সংস্কৃতির আত্মসনে পড়ে পাশ্চাত্যের পরিবারগুলো বহুকাল ধরেই বিপর্যস্ত। যার ফলাফল ওদের আজকের ক্রমবর্ধমান সামাজিক জটিলতা, হিংস্র অপরাধপ্রবণ মনোবৃত্তি আর স্নায়বিক-মানসিক অসুস্থতা। যে কারণে পাশ্চাত্যের পরিবারগুলো আজ সত্যিকার অর্থেই ভাঙনের মুখে।

সে বিবেচনায় আমরা এখনো ভাগ্যবান। যদিও অবিদ্যাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি, ভায়োলেটপূর্ণ টিভি সিরিয়াল ও অসুস্থ বিনোদন আর আর্থসামাজিক নানা কারণে আমাদের পরিবারগুলো বর্তমানে একটি সংকটকাল অতিক্রম করছে। বাড়ছে স্বামী-স্ত্রী কিংবা অভিভাবক-সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি আর অকারণ দূরত্ব। এ অসহনীয় দূরত্ব দূর করতে চাই সমমর্মিতাপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ-যা সৃষ্টি হতে পারে, বহমান ও অটুট থাকতে পারে প্রতিদিন পারস্পরিক কল্যাণ কামনার মধ্য দিয়ে। আর আমরা এর সূচনা ঘটাতে পারি পরিবারে সালাম আদানপ্রদানের অভ্যাসটি গড়ে তোলার মাধ্যমে।

পরিবারগুলোতে একটি সাধারণ অভিযোগ হলো, সন্তান মা-বাবার কথা শোনে না। অনেকে এ-ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করে বসেন। আসলে জীবনের কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে শক্তি প্রয়োগের বদলে কৌশল প্রয়োগ করাটাই সঙ্গত। ওখানে শক্তি প্রয়োগ করতে যাওয়াটাই ভুল। কারণ শক্তি প্রয়োগ করে এখনকার ছেলেমেয়েদের ভুল চিন্তা বা কর্মকাণ্ডকে থামানো যায় না। এর মোকাবেলা করতে হবে বুদ্ধি প্রয়োগ করে।

প্রথমত, সন্তানের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে। সন্তানকে কথা শোনাতে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান আপনার কথা শুনতে চায় না, কিন্তু কেন বন্ধুবান্ধবের কথা শোনে? কারণ সে মনে করছে, বন্ধুরা তার ব্যাপারে বেশি মনোযোগী। অথচ বাস্তবে তার ব্যাপারে মা-বাবার মনোযোগ যে অনেক বেশি, এটা সে বোঝে না। বুঝতে চায় না।

দ্বিতীয়ত, আরেকটা কারণে সন্তান কথা শুনতে চায় না, সেটা হলো বাবা-মা-অভিভাবকদের কথাগুলো সে একইভাবে বহুবার শুনছে। তাই তাকে বোঝাতে হবে একটু অন্যভাবে। পাশে বসিয়ে মমতা দিয়ে বোঝান।

সন্তান তখনই আপনার কথায় প্রভাবিত হবে, যখন সে আপনাকে ভালবাসতে শুরু করবে। সব কাপড় কিন্তু সজোরে মাটিতে আছাড় দিয়ে ধোলাই করা যায় না, কিছু কাপড় খুব আস্তে আস্তে ঘষে পরিষ্কার করতে হয়। সন্তানও তেমনি। এজন্যে আগে তার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন।

আর এ সুসম্পর্ক গড়ে তোলার একটি শক্ত ভিত্তি হতে পারে পরিবারে সালাম বিনিময়। শুধু সন্তানের সাথেই নয়, পরিবারের ছোট-বড় সবার সাথে। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে, ঘর থেকে বেরোনোর আগে, ঘরে ফিরে আগে নিজে সালাম দিন। বড়দের দেখাদেখি ধীরে ধীরে পরিবারের ছোটরাও এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

কারণ সব ভালো কথারই শুভ প্রভাব আছে। আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিদিন হাসিমুখে এই নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ কামনার মধ্য দিয়ে আমাদের পরিবারগুলোতে সূচিত হবে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন।

উচ্চশিক্ষা, ক্যারিয়ার, নিত্যনতুন যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার—এর সবই জীবনে প্রয়োজন; কিন্তু আমরা যেন পশ্চিমা স্রোতে গা ভাসিয়ে না দেই। আমাদের শান্তির উৎস আমাদের পরিবার। তাই পারিবারিক সম্পর্কগুলোকে যেন কোনোভাবে গুরুত্বহীন মনে না করি। পরিবারে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ আসতে পারে, কিন্তু পারস্পরিক বোঝাপড়াটা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তবে কোনো চ্যালেঞ্জ বা কোনো প্রতিকূলতাই শেষপর্যন্ত কোনো সমস্যা নয়।

তথ্যসূত্র : কোয়ান্টাম ওয়াকশপে (১৫ অক্টোবর ২০১৪) গুরুজী শহীদ আল বোখারী
মহাজাতকের আলোচনার নির্বাচিত অংশ

মায়ের
ভুল খাদ্যাভ্যাসে
বাড়ে গর্ভস্থ শিশুর
স্বাস্থ্যঝুঁকি



আট পেরোনো দুরন্ত বালক জোহান। বাড়ির সবাইকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে সে একাই একশ। প্রায় সারাক্ষণই চলছে তার দৌড়ঝাঁপ। কোনো কাজেই নেই একবিন্দু মনোযোগ। জোহানের মা শুরুতে একে বয়সজনিত স্বাভাবিক দুরন্তপনা বলে ধরে নিলেও পরবর্তীতে চিন্তিত হয়ে পড়লেন যখন জোহানের স্কুল থেকে রিপোর্ট এলো।

ক্লাস টিচার জানালেন, গড়পড়তা শিক্ষার্থীদের তুলনায় সে লেখাপড়ায় অনেকটা পিছিয়ে। সহপাঠীদের সাথে খেলতে চায় না। মাঝে মাঝেই অস্বাভাবিকভাবে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে। বাধ্য হয়ে জোহানের মা-বাবা তাকে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে গেলেন। সব দেখে শুনে চিকিৎসক বললেন, জোহান যে রোগে ভুগছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় তার নাম অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার-একটিভিটি ডিজঅর্ডার (এডিএইচডি)।

এটি কোনো বিচ্ছিন্ন গল্প নয়। পাশ্চাত্যে তো বটেই, আমাদের মতো দেশগুলোতেও বর্তমানে এই রোগে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু ঠিক কী কারণে এই রোগের উৎপত্তি ঘটে তা জানতে চলছে নানা গবেষণা-অনুসন্ধান। এতদিন বিজ্ঞানীরা জিনগত ত্রুটিকে দায়ী করলেও যুক্তরাজ্যের কিংস কলেজের একদল গবেষক জানিয়েছেন নতুন তথ্য।

দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তারা দেখেছেন, গর্ভকালীন সময়ে মায়ের ভুল খাদ্যাভ্যাসের সাথে যোগসূত্র রয়েছে সন্তানের এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার। সমীক্ষাটি পরিচালনার জন্যে যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টলে বসবাসকারী সাড়ে ১৪ হাজার পরিবার থেকে গবেষকরা বেছে নেন ১৬৪টি শিশুকে। আর এসব পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যালোচনা করে আসছে দু-যুগ ধরে।

বাছাইকৃত এ শিশুদেরকে দুটো দলে ভাগ করা হয় তাদের আচরণগত সমস্যার ভিত্তিতে। এসব শিশুর মায়ের গর্ভকালীন ও পরবর্তী সময়ের খাদ্যাভ্যাস বিশ্লেষণ করেন গবেষকরা। বিস্ময়ের সাথে তারা লক্ষ করেন, গর্ভাবস্থায় মায়ের পুষ্টিবিভ্রাট প্রভাবিত করে আইজিএফ-২ (ইনসুলিন-লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর-২) জিনের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে। জন্মের আগে ও পরে শিশুর মস্তিষ্কের গঠনে এই জিনের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উভয় দলের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যেসব মা গর্ভকালীন সময়ে অতিরিক্ত

চিনি ও চর্বিযুক্ত খাবার খেয়েছেন তাদের সন্তানদের ডিএনএ-তে ঘটেছে উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সন্তানের মানসিক গঠন। তারা আক্রান্ত হয়েছে হাইপার-একটিভিটি ডিজঅর্ডারে।

সাধারণত সাত থেকে ১৩ বছর বয়সের মধ্যে শিশুদের আচরণে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। আচরণে বিভিন্ন অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। লেখাপড়ায় খারাপ ফলের পাশাপাশি বাড়তে পারে তাদের অপরাধপ্রবণতা। এমনকি বড় হয়ে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে মিথ্যাচার, মারামারি ও চুরি করাসহ নানারকম অপরাধে।

গবেষক দলের প্রধান ড. এডওয়ার্ড বার্কার বলেন, কোনো শিশু যদি সুস্বাদু পুষ্টিগত খাবারের পরিবর্তে অধিক পরিমাণে প্যাকেটজাত (কৃত্রিম ও প্রক্রিয়াজাত) খাবার এবং ফাস্টফুড খায়, তাহলে সে শিশুটিও একসময় আক্রান্ত হতে পারে অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার-একটিভিটি ডিজঅর্ডারে।

তাই গবেষকদের পরামর্শ হলো, এ রোগ নিরাময়ে অকুপেশনাল থেরাপির পাশাপাশি বদলাতে হবে শিশুর খাদ্যাভ্যাস। ফাস্টফুড ও প্রক্রিয়াজাত খাবার পরিহার করে শিশুকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে দানাদার আঁশযুক্ত ও ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে, অর্থাৎ প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসে।

তাই অতিরিক্ত চিনি ও চর্বিযুক্ত খাবার হোক যতই মনোহর ও সুস্বাদু, এসব খাওয়া থেকে বিরত থাকা প্রসূতি মায়েদের জন্যে অত্যন্ত জরুরি। আর ভবিষ্যতে আপনার শিশুসন্তানকে বার্গার কিংবা পিৎজা পরিবেশনের আগে সচেতন হোন। ভেবে দেখুন, আপনি নিজেই তাকে একটু একটু করে মানসিক প্রতিবন্ধিত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন না তো?

তথ্যসূত্র : সিএনএন, ১৯ আগস্ট ২০১৬

নৈতিক শিক্ষা
আপনার সন্তানকে করবে
সততা ও দৃঢ়তায়
আত্মনির্ভরশীল



কখনো কি ভেবে দেখেছেন-আপনার মন আর আবেগের ওপর আপনার চরিত্রের কোনো প্রভাব আছে কিনা? বা থাকলেও তা কতটুকু? শুনুন বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন-

‘অবশ্যই আছে এবং তা আমরা সচরাচর যতটা ভাবি তার চেয়েও অনেক বেশি।’ ২০০৪ সালে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মানবীয় আবেগের সাথে সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার রয়েছে এক সুনিবিড় যোগাযোগ।

অনেক সময় এমন হয় যে, কোনো একটি কাজ শুরু করতে গিয়ে এর প্রয়োজনীয়তা কিংবা এর ভালো-মন্দ পরিণতি চিন্তার আগে আমরা হয়তো ভাবি, কাজটি আমাকে কী কী সুবিধা দেবে বা আমি এতে কতটুকু লাভবান হবো? কখনো কখনো তা আমাদের বিবেকের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দিয়ে হলেও। কিন্তু এমন শত নিগ্রহ-অত্যাচারে বিবেককে দমিয়ে রাখলেও আপনি কখনোই এভাবে বেশিদিন চালিয়ে যেতে পারবেন না।

আসলে নৈতিকতা-মূল্যবোধ মানুষের জীবনের এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, এটা ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেখা দেয় নানামুখী প্রতিক্রিয়া। যার পরিণতি হতে পারে বিদগ্ধটে অস্বস্তি থেকে শুরু করে পাপবোধ অস্থিরতা দুশ্চিন্তা অশান্তি। যদিও অধিকাংশ মানুষই স্বীকার করতে চান না-এসব ভোগান্তির কারণ হচ্ছে তাদেরই অনৈতিক, অবিবেচনাপ্রসূত, দুর্নীতিপরায়ণ ও প্রতারণাপূর্ণ আচরণের ফলাফল।

কিন্তু সত্য এটাই। কারণ জীবনের সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে পারস্পরিক যোগসূত্র। তাই নৈতিক ভারসাম্যহীনতা শারীরিক অসুস্থতার পাশাপাশি মানসিক অশান্তি ও অসুস্থতার সৃষ্টি করে। সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, একজন মানুষের সার্বিক সুস্থতার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো তার চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা এবং সমুন্নত নৈতিক চেতনা।

মানসিক যে-কোনো অসুস্থতা সারাতেও ইদানীং এ ইতিবাচক শক্তিগুলোর সফল প্রয়োগ ঘটানো হচ্ছে নানাভাবে। আর এ-ক্ষেত্রে বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মনের শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে যথাযথ নৈতিক শিক্ষাকেই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

চরিত্রের সংজ্ঞা কী? একজন মানুষের ব্যক্তিত্বই কি তার চরিত্র? সাধারণভাবে তেমনটাই মনে করা হলেও বিষয়টা কিন্তু আসলে তা নয়। ইংরেজি ‘পারসোনালিটি’ শব্দটি এসেছে ‘পারসোনা’ থেকে যার শাব্দিক অর্থ ‘মুখোশ’। যা আপনি বলেন বা বিশ্বাস করেন তা নয়; মূলত চরিত্র হচ্ছে তা-ই, যা আপনি করেন অর্থাৎ যে আচরণগুলোতে আপনি নিত্য-অভ্যস্ত।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা করি, সোজা কথায়, আমাদের অন্তর্গত সত্তার প্রকৃত ধরনটিই আসলে আমাদের চরিত্র। আর ভালো ও উন্নত চরিত্রের অন্যতম প্রধান শর্তটাই হলো ভালো কাজ-যত কঠিন আর ঝুঁকিপূর্ণই তা হোক না কেন। আর আপনি নিজে যে আচরণ অন্যের কাছে প্রত্যাশা করেন না, তা অন্যের সাথে করাটা কখনোই সৎ-চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ নয়।

প্রাচ্যের হাজার বছরের নৈতিক-ঐতিহ্য ও শিক্ষার সাথে সুর মিলিয়ে তাই এ-কালের মনোবিদরাও বলছেন, যদি অন্যের কাছ থেকে ভালো আচরণ প্রত্যাশা করেন তবে আপনিও তা-ই করুন। এতে আপনার একটা অনুপম চারিত্রিক দৃঢ়তা গড়ে ওঠার সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলেও আপনি পরিচিত হয়ে উঠবেন একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ হিসেবে। ফলে আপনার চারপাশের পরিবেশও আপনার জন্যে ক্রমশ হতে থাকবে সুখকর, আনন্দময় এবং নিশ্চিতভাবেই কর্মোপযোগী।

অতএব আপনার সামাজিক প্রভাব বা প্রতিপত্তি যা-ই হোক না কেন, শুধু সদাচরণের পথ ধরেই সবার দৃষ্টিতে হয়ে উঠতে পারেন একজন ব্যতিক্রমী মানুষ; শ্রদ্ধাস্পদ তো বটেই। আপনার এই নৈতিকতাসম্পন্ন মূল্যবোধ অন্যদেরও প্রভাবিত করবে নিঃসন্দেহে।

গবেষকরা বলছেন, চরিত্র-শিক্ষার শুরু হওয়া উচিত শৈশব থেকেই। আর এ দায়িত্ব মা-বাবার একার নয়। মা-বাবা, আত্মীয়-পরিজন, শিক্ষক এমনকি স্কুলের কর্মচারী অর্থাৎ শিশু যাদেরই সংস্পর্শে আসবে সকলের কিছু না কিছু ভূমিকা রয়েছে শিশুর চরিত্র গঠনে।

তবে এ শিক্ষার ক্ষেত্রে ‘যা বলছি তা-ই করো’ পদ্ধতিটি পুরনো একটি পদ্ধতি। ভীতিকর এ পন্থায় শিশুর আচার-আচরণে কিছু ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন হয়তো হয়ে থাকে কিন্তু তা কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ এটি তার মনোজগতকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে খুব সামান্যই। তাই নির্দিধায় আপনি এ পদ্ধতিটি বাদ দিতে পারেন। কারণ এর চেয়ে ঢের ভালো পদ্ধতি আছে আপনার সন্তানকে সচরিত্র করে গড়ে তোলার।

আপনি তাকে কী বলছেন সেটা নয়, বরং আপনার সন্তান প্রতিনিয়ত লক্ষ করে আপনি কী করছেন। আপনার অজান্তেই তার ক্ষুদে চোখ, কান, মনস্তত্ত্ব দিয়ে সে নীরবে প্রত্যক্ষ করছে আপনার সমস্ত আচরণ ও কথাবার্তা। আপনাকে অনুসরণীয় মনে করে বলেই সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমনটা করে থাকে। তার প্রতি আপনার উৎসাহ, সহনশীলতা, কথোপকথন সবকিছুই তাকে দারুণ প্রভাবিত করে।

ব্যাপারখানা অনেকটা এমন যে, শিশুকে চরিত্র শেখানো যায় না, সে নিজেই তা শিখে নেয়। তাই সন্তানের দৃষ্টিতে যদি অনুকরণীয় হতে চান, তবে তাকে যা করতে বলছেন নিজেও তা-ই করুন। তাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে শেখান ক্ষমা আর সমর্মিতার মতো মহত্তম গুণগুলো। এতে তার অন্তর্গত সত্তা ক্রমশ বিকশিত ও আলোকিত হয়ে উঠবে।

এ-ছাড়াও গল্প বলার ছলে শিশুকে কোনোকিছু শেখানোটা বেশ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে শিশু-মনোবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে। প্রতিদিন না হোক, সপ্তাহে অন্তত যে-কদিন যখনই সময় পান আপনার শিশুসন্তানটিকে সময় দিন। আমাদের নৈতিক সংস্কৃতির আবহে রচিত চিরন্তন গল্প, ঘটনা, উপাখ্যানগুলো তাকে শোনান। এর মর্মকথাটা তাকে বুঝিয়ে বলুন। গল্পগুলোর অন্তর্নিহিত নৈতিক শিক্ষা তাকে পরিশ্রমী, বাস্তববাদী ও চরিত্রবান হতে অনুপ্রাণিত করবে। আর এভাবেই তার সাথে গড়ে উঠবে আপনার এক চমৎকার বোঝাপড়ার সম্পর্ক। গল্পের শেষে তার কাছ থেকে এ বিষয়ে মতামত জানতে চান। জিজ্ঞেস করুন, সে কী বুঝল কিংবা গল্পের কোন অংশটি তার সবচেয়ে ভালো লেগেছে এবং কেন? এতে আপনিও তাকে সহজেই বুঝতে পারবেন।

প্রযুক্তির আগ্রাসন আর শত কাজের ব্যস্ততায় শিশুর চরিত্র গঠনে বর্তমানে আমরা প্রায় নিষ্ক্রিয় ভূমিকাই পালন করেছি। কিন্তু যেসব মা-বাবা সচেতনভাবে এ লক্ষ্যে সন্তানদের সময় দিচ্ছেন তারা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান ও সফল। এ উদ্যোগ একদিকে যেমন তাদের সন্তানদের মাঝে সমর্মিতা, সহানুভূতি ও সামাজিক দায়িত্ববোধের জন্ম দিচ্ছে তেমনি এর ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সুস্থ, সৎ ও আত্মনির্ভরশীল নাগরিক সৃষ্টির মাধ্যমে উপকৃত হবে দেশ ও সমাজ।

তথ্যসূত্র : হেলথ এন্ড নিউট্রিশন



সন্তানরা
নীরবে
অনুসরণ করছে
আমাদের

একজন ভুক্তভোগীর অনুভূতি—

‘টেলিভিশন দেখতে বসেছি। চ্যানেল ঘুরে ঘুরে একটা কৌতুক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে থামলাম। পার্শ্ববর্তী দেশের জনপ্রিয় একটি টিভি চ্যানেলের ততোধিক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। নিয়মিত না হলেও বছর চার-পাঁচেক আগে অনুষ্ঠানটা মোটামুটি দেখা হতো। পরিবারের সবাই মিলেই দেখতাম। ভালো লাগত। কিন্তু এ কী?

প্রথম জোকসটা শুনলাম। বিব্রতকর। ভাবলাম, পরেরটা দেখি। কিন্তু না, পরেরটা, তার পরেরটা, একের পর এক অশ্লীল জোকস। আগে সবাই মিলে দেখতাম, সেদিন একা দেখতেই লজ্জা লাগছিল। সেইসাথে বিস্ময়! নির্মল বিনোদনময় একটা অনুষ্ঠান কয়েক বছরের মধ্যেই এমন ভয়াবহ হয়ে উঠল? সর্বত্রাসী বাণিজ্যের যুগে আর প্রতিযোগিতার ভিড়ে চটুল বিনোদনে দর্শক টেনে বাণিজ্য চাহিদা মেটানো, নাকি এ ক’বছরে আপামর দর্শককুলের রুচিবোধ বদলে গেছে একটু একটু করে? নাকি দুটোই? যতই অবাক হই, সত্যটা জানা মুশকিল বটে।

আরো আশ্চর্যের বিষয়, একের পর এক প্রতিযোগী কুৎসিত সব কৌতুক বলে যাচ্ছে আর জনপ্রিয় সপ্রতিভ উপস্থাপক, বিচারক, সেটে বসা দর্শক (এদের মধ্যে প্রতিযোগীদের আত্মীয়, বন্ধু এমনকি কারো কারো মা-বাবা পর্যন্ত আছেন!) সবাই অকুণ্ঠ হেসে, রীতিমতো হর্ষধ্বনি দিয়ে ওদের অভিনন্দিত করে যাচ্ছেন।’

আরেকজনের অনুভূতি আরো করুণ—

‘আমার শোবার ঘরের জানালার ডানে ও বামে অন্য দুটো ফ্ল্যাটের জানালা। দুটো জানালার পাশেই ওদের টিভি সেট। খুব অবাক হয়ে লক্ষ করি, রাতের বেলা একটা নির্দিষ্ট সময়ে দুটো ফ্ল্যাট থেকেই একই চ্যানেলের একই অনুষ্ঠানের শব্দ। দুদিক থেকেই সেই একই ধুমধাড়াঙ্কা সাস্পেন্স জন্ম দেয়া পিলে চমকানো শব্দ আর কঠিন কঠিন সব বাক্যবাণ। পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতই যার মূল উপজীব্য। প্রথম কয়েকদিন খুব যন্ত্রণায় ভুগতাম, এখন দারুণ সয়ে গেছে।’

সয়ে গেছে আসলে আমাদের সবাইই। সয়ে গেছে বলেই না আমরা প্রতিদিন এসব দেখি। হাততালি দেই। কেবল বুঝি না যে, কী দূরপ্রসারী

বিষক্রিয়ায় আমরা আক্রান্ত হচ্ছি নীরবে, আমাদের সন্তানরাই হতে যাচ্ছে যার নির্মম শিকার। পটাশিয়াম সায়ানাইড কিংবা হেমলকের বিষক্রিয়া ঘটে রক্তে; আর এহেন ভার্চুয়াল বিনোদনের বিষ খুব ধীরে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের স্নায়ু থেকে স্নায়ুতে। নানা তথ্য-উপাত্ত গবেষণার আলোকে সমাজবিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক অশান্তি অস্থিরতাই এর পরিণতি। যার সত্যতা ইদানীং স্পষ্টতই দৃশ্যমান। পত্রিকা খুললেই ভয়াবহ আর কুৎসিত যত পদ্ধতিতে নারী ও শিশু নির্যাতনের অদ্ভুত সব খবর। আমরা নির্বিকার!

এসব নিয়ে লেখালেখি আলোচনা কম হচ্ছে না। কিন্তু খাদ্যে ফরমালিন নিয়ে আমরা সরব যতটা, এ নিয়ে ততটা নই। ফরমালিনের প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান; আর এই স্নায়ুঘাতী বিনোদনের প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান হওয়ার সময় এলে আমরা পায়ের নিচে মাটি খুঁজে না-ও পেতে পারি। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে? বাজার অর্থনীতির এ যুগে প্রায় সবকিছুর মূলেই এখন বাণিজ্য। আর আমরা সবাই যে যার জায়গায় আজ কমবেশি পণ্য। রিয়েলিটি শো-র প্রতিযোগী, দর্শক, এমনকি বিচারক আর বিনোদন জগতের নবীন মডেল থেকে টক শো-র প্রবীণ বিশ্লেষক-সবার বেলাতেই বোধ করি কথাটা খাটে।

এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে-আমরা নিত্যদিন এসব বিনোদন-বিষ গিলে গিলে টিভি চ্যানেলের লভ্যাংশ বাড়িয়ে তোলা পণ্য হবো, নাকি সুস্থ মনের রুচিশীল মানুষ? এসব অনুষ্ঠান যারা নির্মাণ করছেন, এর পেছনে বিনিয়োগ করছেন, আমাদের ‘বিনোদিত’ করতে বহু কষ্ট (!) স্বীকার করে প্রচারের ব্যবস্থা করছেন, তাদের কাছে কোনো দাবি জানানো দূরে থাক, প্রচার বন্ধের ন্যূনতম অনুরোধটুকু জানালে হয়তো শুনতে হতে পারে-‘দেখতে না চাইলে টিভি বন্ধ করে বসে থাকুন না মশায়, এত কথা কেন!’

সিদ্ধান্তটা তাই নিতে হবে আমাদেরকেই। এবং দ্রুত। কারণ এই অসুস্থ বিনোদনের পথ ধরে মন ও চিন্তার দিক থেকে আমরা ভয়াবহভাবে প্রভাবিত হচ্ছি। অশান্তি বাড়ছে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, স্বভাবতই শিশুরাও ভুগছে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য নানা জটিলতায়।

সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, আমাদের সন্তানরা কিন্তু নীরবে অনুসরণ করছে আমাদের!!

ইতোপূর্বে ‘দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন’-এ প্রকাশিত, ১০ অক্টোবর ২০১৫

পরিবারকে
সুখী
করার
দায়িত্ব আমার



মওলানা জালালুদ্দীন রুমীর সেই গল্পটা আজও আমাদের পারিবারিক জীবনে বেশ প্রাসঙ্গিক।

‘তিন মুসাফির। একজন আরব, একজন রোমান, একজন পার্সিয়ান। তিন জন একই পথ দিয়ে চলেছে। তারা কেউ একে অন্যের ভাষা পুরোপুরি বোঝে না, কোনোরকম ইশারা-ইঙ্গিতে অল্পস্বল্প কথায় কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। পথ চলতে চলতে তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও গড়ে উঠল।

পথিমধ্যে তারা হঠাৎ একটি খলে কুড়িয়ে পেল। তাতে কিছু স্বর্ণমুদ্রা। তিন জনই উৎফুল্ল। সামনেই বাজার আছে, কিছু ফলমূল কিনে খাওয়া যাবে। আরব মুসাফির বলল, চলো, আমরা ইনাব কিনে খাই। পার্সিয়ান বলল, না, আঙুর কিনব। রোমান বলল, ইনাব আঙুর কোনোটাই নয়, ভিটিস কিনব এবং আমরা সেটাই খাব।

স্বর্ণমুদ্রাগুলো দিয়ে কী কেনা হবে, এ নিয়ে কিছুতেই একমত হতে পারছিল না তারা। এভাবে এককথা-দুকথা, একপর্যায়ে গুরু হলো ঝগড়া। তাদের বন্ধুত্ব রূপ নিল রীতিমতো কলহে। প্রত্যেকেই যার যার কথায় অনড়। একজন কিনতে চায় ইনাব, একজনের পছন্দ আঙুর আর একজনের কথা হলো, ভিটিস কিনতে হবে।

গল্পের এ পর্যায়ে রুমী বলছেন, এই তিন মুসাফিরের জন্যে এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একজন ভাষান্তরকারী বা দোভাষীর, যিনি তিন জনের ভাষাই বোঝেন। তাহলে এদের ঝগড়া খুব সহজেই মিটে যায়। কারণ তারা প্রত্যেকেই একই জিনিস চাচ্ছে, কিন্তু পরস্পরকে বোঝাতে পারছে না। আরবি ভাষায় যা ইনাব, ফার্সিতে তা-ই আঙুর আর একজন রোমান ভাষাভাষীর কাছে তা-ই ভিটিস। অর্থাৎ তিন জনের চাওয়া একই, কিন্তু একে অন্যের ভাষা বুঝতে পারছে না বা বোঝার চেষ্টাও করছে না বলেই তারা জড়িয়ে পড়েছে বিবাদে।’

আমাদের পারিবারিক জীবনও আসলে তা-ই। পরিবারে একজন মানুষ কী চায়? প্রতিটি মানুষ, পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই মূলত একটি জিনিসই চায়। এককথায় বলা যায়, সেটি হলো সম্মান। পরিবারে স্বামী স্ত্রী সন্তান বাবা মা ভাই বোন শ্বশুর শাশুড়ি সবাই চায় মূলত তার প্রাপ্য সম্মানটুকু,

চায় একটা স্বীকৃতি। চায় শ্রদ্ধা, চায় সম্মতি। চায় তাকে একটু মমতার চোখে দেখা হোক। খাওয়াদাওয়াসহ জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় যা-কিছু, সেসব তো একটা পশুও চায়। কিন্তু মানুষ যা চায়, যা নিয়ে বাঁচতে চায়, তা হলো তার সম্মান ও আত্মমর্যাদা। এমনকি ঘরের গৃহকর্মীটি পর্যন্ত ন্যূনতম সম্মান আর মর্যাদা চায়।

ধর্মের চিরন্তন শিক্ষাও তা-ই। পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারা-য় ১৮৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা (স্বামী ও স্ত্রী) পরস্পর পরস্পরের পোশাক’। এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, স্বামী-স্ত্রীর সম্মান ও মর্যাদা নির্ভর করে তাদের পরস্পরের ওপর, তারা একে অন্যের সম্মান। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, দাম্পত্য জীবন এবং পারিবারিক জীবনের মৌলিক চাওয়াটিকে ধর্মীয়ভাবেও অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ এটি ঠিক থাকলে বাকি সবকিছু এমনিতেই সহজ হয়ে যায়।

পরিবারে এক + এক = এগারো

সাধারণভাবে এক যোগ এক সমান দুই, কিন্তু পরিবারে বা একটি পরিবার গড়তে দুজন মানুষ যখন একত্র হন তখন সেটি হয়ে যায় এগারো। অর্থাৎ পরিবারে দুজন মানুষের শক্তি, সামর্থ্য ও কর্মক্ষমতা হয়ে উঠতে পারে এগারো জন মানুষের সমান। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন আমরা সেটা বিশ্বাস করতে পারব এবং সেই দক্ষতা অর্জন করতে পারব।

সার্কাসে দেখা যায়, একজন জাগলার দুহাতে এগারোটি পর্যন্ত বল নিয়ে জাগলিং করতে পারেন, একটি বলও মাটিতে পড়ছে না। কারণ তিনি বিশ্বাস করেছেন এবং এই দক্ষতা অর্জন করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন যে, আমি এটি পারব এবং করে দেখাব।

আমরা অধিকাংশ মানুষই দায়িত্ব নিই—সেটা মনের টানে, মমতার টানে, আবেগের টানে—যে কারণেই হোক। আর আমরা আমাদের পরিবারের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে পারি, কারণ এটা আমাদের প্রাচ্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য।

বিয়ে হলো একটি প্রয়োজন, একটি দায়িত্ব

একটি পরিবারের গুরুটা হয় বিয়ের মধ্য দিয়ে। আমরা বলতে পারি, বিয়ে হলো একটি প্রয়োজন, যা দুজন মানুষের জৈবিক মানসিক আবেগীয় ও সামাজিক চাহিদা পূরণ করে। বিয়েটা হচ্ছে এই প্রয়োজনগুলো পূরণের

একটি উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া। আর এগুলো পূরণের পথে কোনো ঘাটতি অনুভূত হলে সমস্যার শুরুরটা হয় সেখান থেকেই।

অর্থাৎ বিয়ে মানে শুধুই ভালবাসা আর রোমান্টিসিজম নয়, এটি একটি দায়িত্ব। কিন্তু মিডিয়ার রঙিন জগতের প্রভাবে আমরা এটি ভুলে যাই। ফলে সিনেমা নাটক টিভি-সিরিয়ালের অবাস্তব জীবনের সাথে আমরা অনেক সময় আমাদের বাস্তব জীবনকে গুলিয়ে ফেলি। বিয়ে নিয়ে অলীক কল্পনার রাজ্যে ডুবে যাই। কল্পনার ফানুস ওড়াই।

ছেলেরা নায়িকার মতো ও মেয়েরা নায়কের মতো জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী খোঁজে। ভাবে, তার স্বামী বা স্ত্রী সিনেমার স্বামী/ স্ত্রীর মতোই সবকিছু করবে, সব ভুল ক্ষমা করে দেবে, স্বশুর-শাশুড়ি হবে সিনেমায় দেখা স্বশুর-শাশুড়ির মতো। কিন্তু বাস্তব চিত্র প্রায়শই ভিন্ন।

বিয়ে ৯ জীবনের একটি বাস্তব ঘটনা

বিয়ে একটি বাস্তবতা, জীবনের অন্য সব অনুষ্ণের মতো এটি খুবই বাস্তব একটি ব্যাপার। কিন্তু পরিবারের সদস্য যেমন, ভাই বোন বাবা মা সন্তানের সাথে বিরোধ সহজেই ভুলে যাই, ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু দাম্পত্য বিরোধ আমরা ভুলতে পারি না। ভাই বাবা সন্তানের অপরাধ আমরা সহজেই ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু একই অপরাধ স্বামীর ক্ষেত্রে হলে ক্ষমা করতে পারি না। আবার বোন মা কন্যার যে ভুল আমরা এড়িয়ে যাই সহজেই, সেই একই ভুল স্ত্রীর বেলায় আমরা অনেক বড় করে দেখি। কেন?

এর কারণ হলো, বিয়েতে ও দাম্পত্য সম্পর্কে আমরা দিতে চাই কম, কিন্তু পেতে চাই বেশি। এখানে আমরা শুধু হিসাব কষি, আমি কী পেলাম? বৈবাহিক সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা কেবল নিজের অংশটুকু বুঝে নিতে চাই, যার ফলে অনেক ছোটখাটো সমস্যা প্রায়ই রূপ নেয় সংকটে। অথচ এ-ক্ষেত্রে কিছুটা বাস্তববাদী হলে অনেক সমস্যা খুব সহজেই সমাধান করা যায়।

বিয়ের মধ্য দিয়ে একটি বাস্তব ও দৈনন্দিন সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে, আর এ বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা থাকা চাই প্রথম থেকেই। যেমন : স্ত্রী যদি মনে করেন, বিয়ের দিন তিনি যেভাবে সেজেগুজে বসে ছিলেন, তার খাওয়া-দাওয়াসহ অন্যান্য সব কাজকর্মের দায়িত্ব অন্যেরা নিয়েছে-বিয়ের পরও তা-ই ঘটবে, তাকে কিছুই করতে হবে না, কোনো দায়িত্ব নেই, তাহলে সেটি হবে অলীক কল্পনা মাত্র।

আবার পুরুষদের কেউ কেউ নিজের ক্ষমতা, পৌরুষ আর কর্তৃত্ব জাহির করতে গিয়ে বিয়েতে বা বিয়ের পর অনেক অতিরিক্ত ও লোক-দেখানো খরচ করেন। অথচ পুরোটাই হয়তো ছিল ঋণের টাকায়। পরবর্তীতে যখন বাধ্য হয়ে এটি বন্ধ করতে হয়, তখনই ঘটে স্বপ্নভঙ্গ। গুরু হয় দন্দ। তাই প্রত্যেক স্বামীরই উচিত তার আয়-রোজগার সম্বন্ধে গুরুতেই স্ত্রীকে একটি স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া।

এ-ছাড়াও বিয়ের ব্যাপারে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি। প্রথমত, বিয়েটা হতে হবে পাত্র-পাত্রীর পছন্দে। অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী যদি পরস্পরকে বিয়েতে সম্মত হন তবেই বিয়েটা হতে পারে। দ্বিতীয়ত, পারিবারিক পছন্দ বা সম্মতি। তৃতীয়ত, বিয়েটা সবসময় হতে হবে মোটামুটিভাবে সম-সামাজিক, সম-সাংস্কৃতিক, সম-অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে।

যা চাই, তা-ই আগে দিতে হবে অন্যকে ॥

জীবন থেকে শুধু আনন্দটুকুই নিন

যা চাই, তা আগে দিতে হবে অন্যকে। আমি সম্মান চাই, মমতা চাই, সমমর্মিতা চাই-এ জিনিসগুলোই আমাকে আগে দিতে হবে। যদি দিতে পারি তবে আমিও তা-ই পাব এবং সুখী হবো। অর্থাৎ পরিবারকে সুখী করার দায়িত্বটা আগে নিতে হবে আমাকেই।

আপনি যদি আপনার স্বামী/ স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হতে পারেন, হৃদয়ের গভীর থেকে মমতা অনুভব করতে পারেন, সম্মান দিতে পারেন, তবে আজ কাল বা পরশু এই সম্মান এই মর্যাদা আপনি পাবেনই। এজন্যে চাই ধৈর্য।

অনেক সময় আমরা এই ধৈর্যটাই ধরতে পারি না। কিন্তু ধৈর্য, অপেক্ষা আর প্রো-একটিভিটি সুখী জীবনের জন্যে, বিশেষত পারিবারিক শান্তির জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ধৈর্যটাকে অভ্যাসে পরিণত করুন।

আর জীবনে যেমন কিছু আনন্দ আছে, তেমনি আছে কিছু কষ্টও। পারিবারিক জীবনও তার ব্যতিক্রম নয়। যিনি বুদ্ধিমান, তিনি আনন্দের পরিমাণ বাড়ান, আর আনন্দটুকুই শুধু নেন। কষ্ট নেয়ার দরকারটা কী? কষ্টটা তো বোঝা। বোঝা বয়ে নিজের ভার বাড়ানোর চেয়ে বরং আনন্দটা নিয়ে হালকা থাকুন। কখন কে কী বলেছে, বকেছে, সেটি মনে রাখার চেয়ে স্বামী/ স্ত্রীসহ সবার সাথে সুখস্মৃতিগুলো লালন করুন।

আজকের সুখী পরিবারই ভবিষ্যৎ সুখী প্রজন্মের ভিত্তি

আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, আমাদের আজকের সুখী পরিবারই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুখের ভিত্তি, সুখী প্রজন্মের শিকড়। পরবর্তী প্রজন্ম এ শিকড় থেকেই জীবনীশক্তি ও প্রাণরস লাভ করবে।

সুখী সমাজের ভিত্তিও হচ্ছে সুখী পরিবার। সুখী পরিবার ছাড়া সুস্থ সমাজ হতে পারে না। কারণ অসুখী পরিবারগুলোর সন্তানদের শতকরা প্রায় ৮০ থেকে ৯০ ভাগই হয় মাদকাসক্ত, না হয় মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে কিংবা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুখী দেখতে চাইলে তার প্রস্তুতি নিতে হবে মাতৃগর্ভে শিশুর বিকাশের সময় থেকেই। জ্ঞাপাওয়া থেকেই শিশুর মনোদৈহিক বিকাশ শুরু হয়। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল অনুসারে, মাতৃগর্ভে থাকাকালীন শিশু যে কেবল মায়ের চিন্তা দিয়েই প্রভাবিত হয় তা নয়; বরং পারিপার্শ্বিক সবকিছু এমনকি বাবার চিন্তা দ্বারাও সে প্রভাবিত হতে পারে।

সন্তানসম্ভবা মায়ের চারপাশের পরিবেশ যত ভালো থাকবে, ইতিবাচক থাকবে মাতৃগর্ভে সন্তান তত সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে। এ-সময় সন্তানসম্ভবা মায়ের সাথে যত ভালো ব্যবহার করা যাবে, তার শারীরিক-মানসিক যত্ন নেয়া যাবে, তার প্রতি মমতা দেয়া যাবে, তিনি যত আনন্দিত ও উজ্জীবিত থাকবেন, সন্তানের বিকাশ তত ভালো হবে।

এ-ছাড়াও সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিতে বিশেষভাবে সচেতন হোন। সন্তানকে আপনি যত সময় দেবেন সন্তান তত আপনাকে বুঝতে চাইবে, অনুভব করবে। সে আপনার সুখ-দুঃখ আবেগের সাথী হবে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমানে আমেরিকান শিশু-কিশোররা তাদের বাবাদের সাথে কথা বলে দিনে পাঁচ মিনিট, আর টিভি দেখে সাত ঘণ্টা। ফলে তাদের পারিবারিক পরিবেশ ও সমাজ হয়ে উঠছে আগের চেয়ে অস্থিরতাপূর্ণ ও সহিংস।

সন্তান যখন কথা বলতে শেখে তখন সে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে, কৌতূহলী হয়। এসময় তার প্রতি মনোযোগ দেয়াটা খুবই জরুরি। কারণ সে যদি আপনার কাছ থেকে উত্তর না পায় তাহলে সে বাইরে যাবে উত্তর খুঁজতে, আর তাতে সম্ভাবনা আছে বিভ্রান্ত হওয়ার। তাই সন্তানের প্রশ্নের উত্তর দিতে কখনো বিরক্ত হবেন না।

ছোট ছোট উদ্যোগে

সুখী হোক আপনার পরিবার

পারিবারিক মনছবি করুন। আপনার পরিবার ও পরিবারের সদস্যদেরকে কোথায় দেখতে চান, সবাইকে নিয়ে কোথায় পৌঁছতে চান, পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন চান, এ সবগুলো বিষয় একত্র করে মনছবি দেখুন। এর ফলে আপনাদের চাওয়াটা সংজ্ঞায়িত ও সুনির্দিষ্ট হবে।

আসলে অধিকাংশ সময় আমরা বুঝিই না যে, আমরা কী চাই। ফলে কী করব, কীভাবে করব তা-ও বুঝতে পারি না। অন্যদিকে চাওয়াটা সুস্পষ্ট হলে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে দায়িত্ব নেয়া সহজ হয়।

সরাসরি কথা বলুন। স্বামী স্ত্রী বাবা মা শ্বশুর শাশুড়ি শ্যালক ননদ সবার সাথেই আন্তরিকভাবে সরাসরি কথা বলুন, কোনো মাধ্যম ধরে নয়। পরিবারে সহজ যোগাযোগ সবসময় পারস্পরিক সম্পর্কের সেতুবন্ধনটাকে মজবুত করে। মানুষকে কাছে নিয়ে আসে। রাগ ক্ষোভ অভিমান এমনিতেই দূর হয়ে যায়। আর কথা অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই মমতা ও বিনয়ের সাথে কথা বলুন।

পারিবারিক রেওয়াজ গড়ে তুলুন এবং তা অনুসরণে পরিবারের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করুন। যেমন, আমরা আমাদের পরিবারে উচ্চস্বরে চিৎকার, চোঁচামেচি বা ঝগড়া করি না কিংবা পরিবারের সবাই আমরা দিনে অন্তত একবেলা একসাথে খাওয়াদাওয়া করি।

প্রতি বৃহস্পতিবার পরিবারের সবাইকে নিয়ে পারিবারিক মেডিটেশনে অংশ নিন। পরিবারের সবার সুস্বাস্থ্য, সাফল্য ও সার্বিক কল্যাণের নিয়তে মাটির ব্যাংকে দান করে দিনের কাজ শুরু করুন।

একা নয় কিংবা শুধু স্বামী-স্ত্রী নয়, সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে অংশ নিন। সম্ভব হলে মাসে বা বছরে একবার পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যান।

আপনার পরিবারকে ধর্মীয় ও আত্মিক চেতনা এবং নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা ও প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করুন। সেবা ও সৎকর্মের চর্চা শুরু করুন পরিবার থেকেই। পরিবারের প্রতিটি কাজই সৎকর্ম ও ইবাদত।

তাই পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে পরিবারের জন্যে যে-কোনো কাজ আনন্দচিত্তে করুন, বিরক্তি নিয়ে নয়। তাতে কাজের আনন্দ ও সন্তুষ্টি বহুগুণ বেড়ে যাবে।

আজকের প্রয়াসে গড়ে উঠুক সার্থক ভবিষ্যৎ প্রজন্ম

সন্তানসম্ভবা মা-কে সবসময় ভালো কথা বলতে এবং ভালো কিছু পড়তে, দেখতে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করুন। যেমন : অটোসাজেশন, জীবন কণিকা, কোরআনের মর্মবাণী, বিভিন্ন ধর্মবাণীর সংকলন ইত্যাদি। সন্তান জন্মের পর তাকে পাশে রেখে এবং আরো একটু বড় হলে সাথে নিয়ে মেডিটেশন করুন। তাহলে জীবনের শুরু থেকেই সে ইতিবাচকতায় অনুপ্রাণিত হবে।

সন্তানকে আদর করবেন, কিন্তু আল্লাদ দেবেন না। অতিরিক্ত আল্লাদে সন্তান বথে যেতে পারে। চাওয়া মাত্রই সবকিছু দিয়ে দেবেন না, অপেক্ষার পর কোনো জিনিস পাওয়ার যে তৃপ্তি, সেটি তাকে অনুভব করতে দিন। যা সহজেই পাওয়া যায় তাতে কোনো আনন্দ থাকে না।

সন্তানের সাথে দৃঢ় হতে ভয় পাবেন না। কোনো ভুল বা অন্যায় দেখলে প্রয়োজনে দৃঢ় হবেন। সন্তান যখন আপনার দৃঢ়তা দেখবে তখন সে বুঝবে, ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা আপনার আছে এবং আপনি তার প্রতি সচেতন। নৈতিক দৃঢ়তা সবসময় অন্যের কাছে আপনার সম্মানটা বাড়িয়ে দেয়।

সন্তানকে অন্যের সামনে বকবেন না। ভুল করলে তাকে একা ডেকে বলুন। পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীসহ সবার ক্ষেত্রেই এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। যখনই কাউকে অন্যের সামনে বকবেন সে তার ভুলকে যৌক্তিক প্রমাণ করার চেষ্টা করবে এবং যুক্তি-পাল্টায়ুক্তির পর তা একপর্যায়ে ঝগড়ায় রূপ নেবে।

সন্তানকে মারবেন না। যখনই মারলেন, আপনি আপনার সর্বশেষ অস্ত্রটা ব্যবহার করে ফেললেন। কিছু অস্ত্র কখনো ব্যবহার করতে হয় না। এজন্যে সবসময় শক্তি-প্রদর্শন আর সহিংসতা এড়িয়ে চলবেন।

সৎসঙ্গে একাত্ম হোন

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমগুলোর সাথে পারিবারিকভাবে একাত্ম হোন। সাদাকায়ন, আলোকায়ন, ওয়ার্কশপ, মাটির ব্যাংক করসেবাসহ ফাউন্ডেশনের সব অনুষ্ঠানে সপরিবারে অংশ নিন। আপনার পারিবারিক প্রশান্তি বাড়বে, পারিবারিক আবহ হয়ে উঠবে আরো সহজ স্বতঃস্ফূর্ত সমমর্মী ও সহযোগিতাপূর্ণ।

ফাউন্ডেশনের নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলে আপনার পরিবারের সদস্যদের আত্মিক শক্তি বিকশিত হবে। জীবনদৃষ্টি হবে সঠিক ও ইতিবাচক। ফলে পরিবারের সবার মধ্যে পরস্পরকে বোঝার, অনুভব করার ও অনুপ্রাণিত করার শক্তি বাড়বে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুন্দর ও আলোকিত বিকাশের জন্যে এটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র : কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত পারিবারিক ওয়ার্কশপে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের আলোচনার নির্বাচিত অংশ, ১ নভেম্বর ২০১৩

মমতা বা ভালবাসা হচ্ছে
সকল সুসম্পর্কের প্রাণ।
মমতা অপরপক্ষকে বিচার করে না,
বোঝার চেষ্টা করে।
প্রভাবিত করে না,
তার সাথে অংশগ্রহণ করে।

কাউকে
না কাউকে তো
শুরু
করতে হবে



সেলফি নিয়ে সবচেয়ে মজার জোকসটা শুনবেন?

বাসায় কাজের লোক নেই, এ নিয়ে গৃহকর্ত্রী পেরেশান। অগত্যা কদিন পর মহল্লা থেকে নিজেই খুঁজে নিয়ে এলেন একজনকে। দিন কয়েক পর বান্ধবীদের আড্ডায় এ নিয়ে গল্প হচ্ছিল। একজন সাবধান বাণী দিলেন—‘চেনাশোনা ছাড়া কাকে না কাকে খুঁজে এনেছ, বিশ্বাস করা যায় নাকি কাউকে আজকাল? দিনকালের যা অবস্থা, একটা ছবিটবি অন্তত তুলে রাখা উচিত ছিল।’ সরল মনে গৃহকর্ত্রী বললেন, ‘এভাবে ছবি তোলার কথা বলা যায় নাকি যে, বুয়া, দাঁড়াও তোমার একটা ছবি তুলি? সে কী মনে করবে? বুঝবে না যে, তাকে সন্দেহ করছি?’

এ-যুগে এহেন নির্বুদ্ধিতায় (!) তার বান্ধবীরা রীতিমতো বিস্মিত, তৎক্ষণাৎ ওরা বাতলে দিলেন মোক্ষম সমাধানটি—‘এভাবে বলবে কেন? বলবে, আসো বুয়া তোমার সাথে একটা সেলফি তুলি!’

হাটে মাঠে ঘাটে রাস্তায় বাড়িতে গাড়িতে, পানির নিচে, সোজা হয়ে, চিৎ কিংবা তেরছা হয়ে আমরা সেলফি তুলে যাচ্ছি বিরামহীন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেল, পবিত্র হজব্রত পালন করতে গিয়ে তাওয়াফ করার সময়ও কেউ কেউ সেলফি তোলায় মহান কাজটি সেরে নিচ্ছেন!

আমরা নিজেরাও অনেক সময় বুঝি না যে, আমরা আসলে কতটা হাস্যকর হয়ে পড়ছি।

আগে আমরা কথা বলতাম। বন্ধুতে বন্ধুতে, মা মেয়েতে, বাবা ছেলেতে, ভাই বোনেতে কত কথাই না হতো! সারাদিন কী করলাম, কোথায় গেলাম, কী খেলাম, কার কার সাথে দেখা হলো ইত্যাদি বিচিত্র আলাপ। এহেন প্রাণবন্ত আলাপচারিতায় আমরা পরস্পরকে বুঝতাম, টের পাওয়া যেত হৃদয়ের উষ্ণতা। বাড়ত হৃদয়তা। সবকিছু ছিল জীবন্ত ব্যাপার। এখনো কথা হয়। আমরা প্রতিদিন কথা বলি। তবে ফেসবুকে। ফেসবুক স্ট্যাটাসে চলে হৃদয়ের অনুভূতির আদান-প্রদান।

বাবার জন্মদিন। ছেলে ভীষণ আবেগময় ভাষায় স্ট্যাটাস দিল—‘আমার বাবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা। বাবা, তোমাকে অনেক ভালবাসি ...।’ বাবা পড়লেন। আবেগকাতর হলেন। ততোধিক আবেগমথিত ভাষায় স্ট্যাটাস

দিলেন পুত্রকে উদ্দেশ্য করে। ছেলের প্রতি জানালেন তার ভালবাসার ডিজিটাল অনুভূতি।

পাঠক কী ভাবছেন? বাবা-ছেলে বহু দূরে থাকেন, না জানি কত দিন ওদের দেখা নেই! না, ঘটনা সে-রকম নয়। বাবা-ছেলে দুজনেই থাকেন একই শহরে। একই বাসায়! দুই রুমের মাঝখানে একটা মাত্র দেয়াল। এমন নয় যে, দুজনের মাঝে সম্পর্কের দূরত্বটা অনেক। বরং দুজনের সম্পর্ক বন্ধুর মতো। তবু সেদিন এ নিয়ে আর কোনো কথাই হলো না দুজনের। হাসিমুখে বাস্তবিক শুভেচ্ছা বিনিময় কিংবা মমতাময় স্পর্শ-কিছুই না। যা বলার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বলা হয়েছে, পরিচিতরাও সবাই দেখেছে, তাই তো যথেষ্ট। আবার কী!

ঘটনা কিন্তু কাল্পনিক নয়। একেবারে সত্যি। ঘরে ঘরে এ এখন এক মারাত্মক ব্যাধিই বটে। মা বসে আছেন টিভি-সিরিয়াল নিয়ে, বাবা ব্যস্ত ল্যাপটপে, ছেলে ফেসবুকে আর মেয়ে ছুটল কাউকে টেক্সট করতে। সবমিলিয়ে জীবনটা এখন আগাগোড়াই ভারুয়াল।

আমরা এভাবেই মেতে থাকি সবসময়। কিছু না কিছু নিয়ে। যা দিয়ে আমাদের মাতিয়ে তোলা হয়, মাতিয়ে রাখা হয় আমরা তা-ই নিয়ে মেতে থাকি। ভেবেও দেখি না কখনো। একেকটা সময় একেকটা নতুন নতুন উন্মাদনা আসে। আমরা নিশ্চিতচিত্তে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বছর কয়েক আগে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় এলো নতুন হুজুগ ‘ফ্ল্যাশ-মব’। চার ছক্কা হই হই/ বল গড়াইয়া গেল কই গানের তালে রাস্তা আটকে উদ্দাম নৃত্য। দেশজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সোৎসাহে নাচল গাইল তারুণ্যের উৎসাহ-উচ্ছ্বাসে আর প্রাজ্ঞ প্রবীণেরা ততোধিক উৎসাহে তা প্রচার করলেন তাদের পত্রিকা আর সংবাদমাধ্যমে। কিন্তু ঠিক কেন এই ফ্ল্যাশ-মব? এত হুলস্থূল করে কেন নাচলাম, গাইলাম, নেচেই-বা কী লাভটা হলো, কিছুই আমরা জানি না।

আমরা যখন ধীরে ধীরে নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভুলে অর্থহীন আনন্দে সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছি, ফ্ল্যাশ-মব, ফেসবুক ইত্যাদি নিত্যনতুন উন্মাদনায় অস্থির হয়ে আছি, পাশ্চাত্যের সচেতন মানুষ তখন কী করছে? খোঁজ নিয়েছি কখনো? ওরা এখন উপলব্ধি করছে যে, দিনের পর দিন এসব মাতামাতি শেষপর্যন্ত আসলে অনর্থ বটে। তাতে ক্রমাগত নিজেকেই হারিয়ে ফেলে মানুষ। তুলনায় নিজের দিকে ফিরে তাকানো ঢের লাভজনক। এবং জরুরি। শান্তির জন্যে, স্বস্তির জন্যে।

পাশ্চাত্যেও ফ্ল্যাশ-মব হচ্ছে, তবে তা কেবলই গানবাজনা ও হইচই সর্বস্ব নয়। ওরা এখন ক্রমশ ঝুঁকছে প্রশান্তির দিকে। ওদের সচেতন অংশ উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে, প্রশান্তিটাই জীবনের জন্যে সবচেয়ে জরুরি। তাতে স্বাস্থ্য, পেশা, পরিবার, সমাজ সবখানেই আসে একটা সুন্দর গতিময়তা আর অপূর্ব জীবনছন্দ।

প্রশান্তির প্রয়োজনটা তাই ওরা ভালোই বুঝছেন। বুঝছেন ওদের সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী-সহ সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষেরাও। তাই তো সেন্ট্রাল লন্ডনের ব্যস্ততম জনবহুল স্থান ট্র্যাফলগার স্কয়ারে ওরা সমবেত হন মেডিটেশন ফ্ল্যাশ-মবে, যেখানে বিভিন্ন বয়সী শত শত তরুণ-যুবা-বৃদ্ধ নারী-পুরুষকে দেখা যায় খোলা আকাশের নিচে চোখ বুঁজে মাটিতে বসে আছেন নানা ধ্যানভঙ্গিতে।

এটি শুরু হয়েছিল মূলত ২০১১ সালের জুনে। তারপর বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের আয়োজনে এমন ফ্ল্যাশ-মব একাধিকবার অনুষ্ঠিত হয়েছে লন্ডনে, বার্সেলোনায়, মেক্সিকো সিটিসহ ইউরোপের আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে। দলবদ্ধ মেডিটেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের সে কী প্রশান্তিময় উচ্ছ্বাস! (ইউটিউবে খুঁজলেই এই ভিডিওগুলোর দেখা মিলবে, অগ্রহী পাঠক দেখে নিতে পারেন।)

সিদ্ধান্তটা এখন নিতে হবে আসলে আমাদেরকেই। পাশ্চাত্যের ছুড়ে ফেলা ভার্টুয়াল ওয়ার্ল্ডের কঙ্কাল-সংস্কৃতি নিয়েই আমরা আকর্ষণ মেতে থাকব? নাকি সারা পৃথিবীর সচেতন মানুষ যে একটু একটু করে আলোকময় প্রশান্তির খোঁজে নৈতিকতা, ধ্যান ও আত্মনিমগ্নতার দিকে ঝুঁকছে— আমরা সেদিকে যাব? আমরা সোৎসাহে দাবি করি বটে যে, এসব আমাদের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। কিন্তু চর্চার বেলায় আমরা কতটা উদ্যোগী ও আন্তরিক?

একথা কাউকে আজ বলে বোঝানোর কিছু নেই যে, সামাজিক পারিপার্শ্বিক পেশাগত বিভিন্নমুখী অস্থিরতার দরুন নানাভাবে আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিজীবন ও আমাদের মনোদৈহিক স্বাস্থ্য। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের পরিবারগুলো। যার ফলশ্রুতিতে এত মাদকাসক্তি, নারী নির্যাতন, মনোসামাজিক ব্যাধি এবং আরো অনেক কিছু।

তাই পরিবার সমাজ মানুষ বাঁচাতে সর্বোপরি আমাদের চিরায়ত নৈতিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ঘটাতে নিজেদের দিকে ফিরে দেখা, নিজেদের উন্নত সাংস্কৃতিক অনুশঙ্গগুলোর চর্চা এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি। কারণ

অন্ধকার দূর করার উপায় নিয়ে আমরা কমিটি-কমিশন গঠন করতে পারি, দিস্তা দিস্তা কাগজে রচনা করতে পারি দশাসই গবেষণা-প্রবন্ধ, কিন্তু সত্য হলো, একটু আলো জ্বালালেই এক ঝটকায় দূর হয়ে যায় সমস্ত অন্ধকার। আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণই হতে পারে সেই কাজীকৃত আলো। এর চর্চা এখন একটু একটু করে শুরু করে দিলেই হলো।

আর কাউকে না কাউকে তো শুরু করতে হবে।

ইতোপূর্বে 'দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন'-এ প্রকাশিত, ২৯ মে ২০১৬

বয়স ১৮ হওয়ার আগে
সন্তানকে স্মার্টফোন দেবেন না।
ভার্চুয়াল ভাইরাস—ফেসবুক,
অনলাইন গেম, ভিডিও গেম,
ইউটিউব-আসক্তি তার
হতাশা, বিষণ্ণতা ও
আত্মহননের
কারণ হতে পারে।

সুস্পষ্ট
লক্ষ্যই
আনে কাজিক্ত
সাফল্য



গল্প নয়, সত্যি।

১২ কী ১৩ বছর বয়স ছেলেটির। ঢাকার উদয়ন স্কুলে পড়ে সে, ক্লাস সিক্সে। পড়াশোনায় মনোযোগী, এর পাশাপাশি বিজ্ঞানের নানা খুঁটিনাটিতে তার বেশ আগ্রহ। আশৈশব ইচ্ছে তার মহাকাশ বিজ্ঞানী হবার। অন্তহীন মহাকাশের গলি-ঘুঁপটির সীমাহীন রহস্য তাকে খুব টানে।

একদিন মা-র উৎসাহে বড় বোনের সাথে সে এলো মেডিটেশন ক্লাসে। শিখল মনছবি কীভাবে করতে হয়। জানল, মনছবি অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্য একবার কোনোভাবে মনে গেঁথে গেলে তা অর্জিত হবেই—সেটি আজ হোক বা কাল। মনছবি যে কাজ করে স্বয়ংক্রিয় এক মিসাইলের মতোই!

ছেলেটি মনছবি করল—সে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হবে। আর এজন্যে তাকে পড়তে হবে এস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে। যেই ভাবা সেই কাজ। মনছবি ঠিক। একথা শুনে কোর্সের প্রশিক্ষক রীতিমতো বিস্মিত, জিজ্ঞেস করলেন তাকে—এস্ট্রোফিজিক্স তো বাংলাদেশে পড়ানো হয় না, তাহলে? সদ্য মনছবি শেখা ছেলেটি তখন বেশ সপ্রতিভ। দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে সে উত্তর দিল, আমি জানি! আমেরিকাতে পড়ানো হয়। আমি ওখানে গিয়েই পড়ব।

১৯৯৬ সালের কথা সেটা।

এর ঠিক ২০ বছর পরের ঘটনা। ৬ জানুয়ারি ২০১৬। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় বসেছে আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির ২২৭ তম বার্ষিক সভা। সে-দেশের জাঁদরেল সব মহাকাশ বিজ্ঞানীরা সেদিন ওখানে হাজির। একসময় মঞ্চে উঠলেন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসা-য় গবেষণারত একজন তরুণ গবেষক। পড়তে শুরু করলেন তার গবেষণাপত্র, সবাইকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করলেন, মহাকাশে পাঁচটি সুপারস্টার বা অতিতারকার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে তার দল!

আর এর মধ্য দিয়ে সমাধান মিলেছে প্রায় পৌনে দু-শ বছরের পুরনো একটি মহাজাগতিক সমস্যা। পৃথিবীজুড়ে মহাকাশ বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মাঝে হইচই পড়ে গেল। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এ যে এক অভূতপূর্ব সাফল্য!

কুড়ি বছর আগের সেই কিশোরটিই আজকের এই তরুণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি ড. রুবাব খান। তার নেতৃত্বেই মহাকাশে পাঁচটি

সুপারস্টারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি বাংলাদেশেরই সন্তান। ঢাকার উদয়ন স্কুল থেকে বাংলা মাধ্যমে এসএসসি ও নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি সম্পন্ন করার পর ফুল স্কলারশিপ নিয়ে তিনি ভর্তি হন যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির এস্ট্রোফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে। তারপর ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এস্ট্রোনমি-তে পিএইচডি করে ২০১৪ সালে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে যোগ দেন নাসা-র গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারে। বাকিটা তো ইতিহাস।

বন্ধু-সহপাঠী ও অন্যদের সাথে রুবাবের পার্থক্য ছিল একটাই। জীবনের শুরুতেই তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন—তিনি কী হতে চান। কী করতে চান। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি ছিলেন তার লক্ষ্যে অবিচল। তার এ সাফল্যের বীজ তাই অঙ্কুরিত হয়ে গিয়েছিল সেই শৈশবেই।

এবার অন্যরকম আরেকটি সাফল্যের গল্প শোনাই। এ-ও এক সত্যিকারের বিজয়গাথা।

১৩ বছর বয়সী এক স্কুলপড়ুয়া বালক। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলায় তার খুব আগ্রহ। তার মনছবি অর্থাৎ জীবনের লক্ষ্যটাও বেশ বড়। তার ইচ্ছে—সে অলিম্পিকে সোনা জিতবে। যদিও তার দেশ থেকে কেউই তখন পর্যন্ত ওটা পারে নি। কিন্তু ঐ যে তার লক্ষ্য! তার মনছবি! লক্ষ্যটা অবশ্য শৈশবেই তার মধ্যে বুনে দিয়েছিলেন ছেলেটির দাদা, যিনি ছিলেন সে দেশটির ইতিহাসে প্রথম অলিম্পিয়ান। দাদা ছিলেন লং জাম্পার, নাতির আগ্রহ সাঁতারে। সাঁতারই তার ধ্যানজ্ঞান।

এর মধ্যেই একদিন জানা গেল বিশ্বসেরা সাঁতারু এসেছেন তাদের দেশে। তাদেরই শহরে! বিশ্বাসই হচ্ছিল না যেন ছেলেটির। তিনি যে তার স্বপ্নের নায়ক, এক নামে যার দুনিয়াজোড়া খ্যাতি। তাকে সেদিন কাছে পেয়ে সবার সে কী হুড়োহুড়ি। যদি একটা ছবি অন্তত তোলা যেত তার সঙ্গে! ছেলেটিও পেল সেই কাজ্জিত সুযোগ। আর সেদিনই বুঝি জীবনটা পাল্টে গেল তার। পরের বছর ছেলেটির পরিবার পাড়ি জমাল যুক্তরাষ্ট্রে। তাতে কী? লক্ষ্য তার অটুট—অলিম্পিকে সোনা সে জিতবেই।

আট বছর পর। ২০১৬ সালের ব্রাজিল অলিম্পিকে ১০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতার ইভেন্টে সেই বিশ্বসেরা সাঁতারুকে হারিয়ে দিল মাত্র ২১ বছর বয়সী এক তরুণ। কে সে?

এতক্ষণে নিশ্চয়ই সবার বোঝা হয়ে গেছে কাদের কথা বলা হচ্ছে। হাঁ তা-ই। বিশ্বখ্যাত সাঁতারু মাইকেল ফেল্প্‌স আর তাকে পুলে হারিয়ে দেয়া

সিঙ্গাপুরের জোসেফ স্কুলিংয়ের কথাই বলা হচ্ছে। আট বছর আগেই সেই বালক স্কুলিং-ই ২০১৬-র অলিম্পিকে হারিয়ে দিল তার স্বপ্নের নায়ক সর্বকালের সেরা অলিম্পিয়ান ফেল্প্স-কে।

এখানে যে দুটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করা হলো তার প্রেক্ষাপট ভিন্ন, পরিস্থিতিও ভিন্ন। ঘটনা দুটোও দুই ভিন্ন ভিন্ন দেশের। কিন্তু সাযুজ্য অর্থাৎ মিলটা কোথায়? সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। খুব অল্প বয়সেই এ দুজন বালক তাদের লক্ষ্য স্থির করতে পেরেছিল। তারা জানত-কোথায় তাদের যেতে হবে। এবং সেই লক্ষ্যকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্যে ছিল ওদের প্রতিদিনের প্রাণান্ত প্রয়াস। কঠোর পরিশ্রম ও নীরব সাধনার পথ ধরে একটু একটু করে ওরা ক্রমশ এগিয়ে গেছে ওদের লক্ষ্য অর্জনের পথে।

ফলে কয়েক বছর আগেও যা ছিল তাদের পক্ষে আপাত অসম্ভব, সেটিকেই তারা পরিণত করেছে সত্যিকারের সাফল্যে। নিজেরা হয়ে উঠেছে বহু মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস, সেইসাথে সম্মানিত করেছে নিজের পরিবার এবং দেশকে। আসলে বিশ্ব ইতিহাসে এমন প্রত্যেকটি উচ্চতর সাফল্যের রহস্য শেষপর্যন্ত এটাই। একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্যের পথে অবিরাম ছুটে চলা।

মানুষের জীবনে লক্ষ্য হচ্ছে এমন এক ধন্বন্তরি চালিকাশক্তি, যা তাকে কর্মোদ্যমী ও শক্তিমান রাখে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে। কখনো পথ হারাতে দেয় না। আমরা সবাই জানি, আমাদের মস্তিষ্ক এক বিস্ময়কর জৈব কম্পিউটার। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সুপার কম্পিউটারের চেয়েও যা বহুগুণ শক্তিশালী ও করিৎকর্মা।

একবার যদি কোনো লক্ষ্য এতে সেট করে দেয়া যায়, তাতে অবিচল থেকে কাজ করে যাওয়া যায়, তবে একদিন না একদিন তা অর্জিত হবেই। এটাই সত্য। এটাই চিরন্তন। পৃথিবীর এ-যাবতকালের সকল সফল মানুষ জেনে-বুঝে কিংবা অবচেতনে এই সাফল্যসূত্রটিই অনুসরণ করেছেন। এবং নিশ্চিতভাবেই সফল হয়েছেন। যেমনটা হতে পারি আমরা যে-কেউই।

সহযোগিতা
সবার সাথে
প্রতিযোগিতা
নিজের সাথে



আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও খ্যাতিমান পরমাণুবিজ্ঞানী। দুর্গম অঞ্চলের প্রত্যন্ত একটি স্কুল পরিদর্শন করছিলেন তিনি। মেধাদীপ্ত কৌতূহলী শিক্ষার্থীদের সাথে সেদিন নানা গল্প হচ্ছিল তার। গল্প-কথার ফাঁকে সুন্দর ও মানবীয় কিছু জীবনদর্শনে তিনি ওদের উদ্বুদ্ধ করছিলেন। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ছুড়ে দিলেন একটি অন্যরকম ধাঁধা।

ব্ল্যাকবোর্ডে একটি সরলরেখা টানলেন। তারপর বললেন, এবার আমি এটিকে ছোট করতে চাই। কিন্তু একে কেটে বা মুছে ছোট করা যাবে না। এখন বলো, কীভাবে এই কাজটা করতে পারি?

বুদ্ধির খেলা, সন্দেহ নেই। প্রিয় পাঠক, শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আপনিও চিন্তা করতে থাকুন—এর সমাধান কী হতে পারে। এই সুযোগে আমরা মূল লেখায় প্রবেশ করি।

সহযোগিতা আর প্রতিযোগিতা। আদতে পাঁচটি অক্ষরের কাছাকাছি দুটো শব্দ, কিন্তু শব্দার্থে পার্থক্য যোজন যোজন। প্রথমটায় সুখ শান্তি সাফল্য। দ্বিতীয়টায় স্ট্রেস অশান্তি আর ব্যর্থতার সম্ভাবনাই বেশি। সবই বুঝি বটে, তবু জীবনের বিভিন্ন সময় আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির আগ্রাসনে পড়ি। এ যে খুব বুঝে শুনে বা ইচ্ছাকৃতভাবে আমরা করি তা-ও নয়। জীবনে চলার পথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে কিংবা অবচেতনভাবেই এটা আমাদের ভেতর কাজ করতে শুরু করে।

ছাত্রজীবনে, পেশাজীবনে এমনকি সংসার এবং পারিবারিক জীবনেও আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির আগ্রাসনের শিকার হই। ‘আগ্রাসনের শিকার হই’ বলার কারণ, প্রতিযোগিতার মনোভাব আমরা পোষণ করি অন্যের সাথে ঠিকই কিন্তু ক্ষতিটা হয় আসলে আমাদের নিজেদের।

কীভাবে? একটু খতিয়ে দেখা যাক।

প্রথমেই আমরা দেখি, এ দৃষ্টিভঙ্গির উৎস কী? এর উৎস খুঁজলে দেখা যাবে এর মূল কারণ হলো ঈর্ষা, যা হতে পারে বন্ধু সহকর্মী সহপাঠী যে-কারো প্রতিই। উদাহরণ : এমবিএ ক্লাসে একবার শিক্ষক তার ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করেছিলেন—ধরো, তোমার একটি কোম্পানি আছে। এখন তোমার সামনে আছে দুটি কর্মপ্রক্রিয়া। একটি প্রক্রিয়া অনুসারে কাজ করলে তোমার কোম্পানির ১% লাভ হবে, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিরও

১% লাভ হবে। অন্য আরেকটি প্রক্রিয়া অনুসারে কাজ করলে তোমার ২% লাভ হবে, আর তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর লাভ হবে ৩%। এখন তুমি কোন প্রক্রিয়া অনুসারে তোমার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবে?

বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, ঐ ক্লাসের ৯৯% ছাত্রছাত্রী উত্তর দিয়েছিল, আমার ২% লাভের দরকার নেই, তাহলে তো প্রতিদ্বন্দ্বী ৩% লাভ করবে। তার চেয়ে বরং আমি সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করব যাতে আমার ১% লাভ হোক এবং অন্য কোম্পানিরও ১% লাভই থাকুক!

এটাই হলো ঈর্ষা।

অথচ এখানে যদি চিন্তা করা হতো—আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর ৩% লাভ হচ্ছে হোক, আমারও তো ২% লাভ হচ্ছে। এতে আমার কোম্পানির আর্থিক উন্নতি হবে। আমার কর্মীরা উপকৃত হবে। কোম্পানির সুনাম হবে। এই মুনাফার মাধ্যমে আমি ভবিষ্যতে নতুন প্রজেক্টে হাত দিতে পারব। আরো পরিশ্রম করলে একদিন প্রতিদ্বন্দ্বীকেও ছাড়িয়ে যেতে পারব।

কিন্তু তা না করে অসুস্থ প্রতিযোগিতার ফাঁদে পড়ে আমরা আসলে নিজেদের সমৃদ্ধির পথেই বাধার সৃষ্টি করি। অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও এর ফলে আত্মঘাতী আচরণের ফলে নিজেদের সাফল্যকেই বাধাগ্রস্ত করি। পাশাপাশি শারীরিক-মানসিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হই।

কারণ এ ধরনের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় একজন মানুষকে স্ট্রেসের নির্মম জালে বন্দি করে রাখে—বন্ধু আমার চেয়ে এগিয়ে গেল, প্রতিবেশী আমার চেয়ে এগিয়ে গেল, সহপাঠী আমার চেয়ে এগিয়ে গেল, সহকর্মী আমার চেয়ে এগিয়ে গেল। আমি যে পিছিয়ে রইলাম!

এসব সার্বক্ষণিক স্ট্রেস প্রকারান্তরে নানা রকম সাইকো-সোমাটিক রোগ ও বিশেষত করোনারি হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ। আমরা জানি, স্ট্রেস মানবদেহের সিমপ্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমকে উদ্দীপ্ত করে। এড্রেনাল গ্ল্যান্ড থেকে কর্টিসোল হরমোনের নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয় যা স্ট্রেস হরমোন নামে পরিচিত। ফলে করোনারি ধমনী সংকুচিত হয়, স্বভাবতই রক্তপ্রবাহ কমে যায়।

গত শতকের ষাটের দশকে যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোর দুজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডা. মেয়ার ফ্রেডম্যান ও রে রোজেনম্যান তাদের যৌথ গবেষণায় দেখান হৃদরোগের সাথে অস্থিরচিন্তা, বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভুল জীবনচরণের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। এ-ছাড়াও প্রতিযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সৃষ্ট স্ট্রেস শরীরে

বিষাণু বা টক্সিন সৃষ্টি করে, যা শরীরের রোগ-প্রতিরোগ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়।

প্রতিনিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আচরণ নার্ভাস সিস্টেমকে দুর্বল করে এবং শরীর-মনকে করে তোলে অবসন্ন ও অবসাদগ্রস্ত। কাজে গতি কমে যায়। কোনো কাজে মনোযোগ থাকে না। ব্যাহত হয় স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি। বিষণ্ণতার ঝুঁকি বাড়ে।

সাইকোথেরাপিস্টরা বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে শরীরে ঘটে চলে এত রকম বিপদ, অথচ সত্য হলো—কারো সাথেই কারো প্রতিযোগিতা হয় না। কারণ প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। জীবনদর্শন ভিন্ন। জীবনের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যও তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরোপুরি ভিন্ন।

তাই বলা যায়, প্রতিযোগিতা আসলে হয় নিজের সাথে নিজের। আমার বর্তমান অবস্থানকে ক্রমাগত প্রচেষ্টায় ছাড়িয়ে যেতে পারলেই আমি সফল। এ প্রতিযোগিতা আজকের ‘আমি’র সাথে আগামীকালের ‘আমি’র।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত একটি দিনব্যাপী ওয়ার্কশপে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ আলোচনা উপস্থাপন করেন এবং উপসংহার টানেন সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি বাক্য দিয়ে, সেটি হলো, ‘সহযোগিতা সবার সাথে, প্রতিযোগিতা নিজের সাথে।’

আসলে নিজের ভেতর থেকে প্রতিযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও ঈর্ষার বিষ সমূলে উৎপাটনের মূল সূত্র এটাই। পৃথিবীর সফল মানুষেরা নিজেদের জীবনে এটাই চর্চা করেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের তিনশ জন খ্যাতিমান ও সফল মানুষের সাফল্যের রহস্য ও জীবনদর্শন নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা একবার একটি অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। তাদের সাফল্যের পেছনে অনেকগুলো কারণও শনাক্ত করা হয়েছিল।

কিন্তু দেখা গেছে, একটি কারণ সবার মধ্যেই বিদ্যমান—আমি জিতব, কিন্তু আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যেন না হারে। অর্থাৎ আমিও জিতব সেও জিতবে। আমার অগ্রযাত্রায় যেন অন্যের কোনো ক্ষতি না হয়।

তাহলে অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষার আগ্রাসন থেকে বেরিয়ে আসার উপায়? পূর্বে উল্লিখিত আলোচনায় গুরুজী তার সমৃদ্ধ জীবন-অভিজ্ঞতার আলোকে দিয়েছিলেন কিছু বাস্তব পরামর্শ :

প্রথমত, জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন অর্থাৎ সর্বাবস্থায় শুকরিয়া। যা আছে তার

জন্যে পরম স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞচিত্ত থাকুন। নিজের কর্মক্ষমতা, শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বেশি বেশি ভাবুন। দ্বিতীয়ত, নিয়মিত মেডিটেশন করুন। মন প্রশান্ত হলে সকল নেতিবাচকতা আপনার ভেতর থেকে বেরিয়ে যাবে। তৃতীয়ত, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বা যার প্রতি ঈর্ষ্যা অনুভব করেন তার জন্যে দোয়া করুন। অন্যের সাফল্যে নিজের সাফল্যের মতোই আনন্দিত হোন। এ প্রসঙ্গে নবীজীর (স) একটি হাদীস আমরা মনে রাখতে পারি। ‘নিজের জন্যে যা আকাঙ্ক্ষা করো অন্যের জন্যেও তা-ই আকাঙ্ক্ষা করো। তাহলেই তুমি প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারবে।’

এবার ফিরে আসা যাক সেই ধাঁধার উত্তরে।

ঘটনার স্থান আর পাত্রদের পরিচয়টা এবার জানিয়ে দেই। পরমাণুবিজ্ঞানী ড. এম শমশের আলীর সাথে কথা হচ্ছিল বান্দরবান লামায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের। ওরা যখন কোনোভাবেই এর কোনো কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন অধ্যাপক শমশের আলী নিজেই দিলেন এর উত্তর আর তুলে ধরলেন এর নৈতিক শিক্ষাটি।

‘আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতাম, ওখানকার ছাত্রদেরও একবার এটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। একজন ছাত্র বলেছিল, স্যার, সরলরেখাটিকে একটু মুছে দিলেই তো হয়ে যেত। কিন্তু দেখ, এটা মুছে দেয়ার দরকার ছিল না। এর পাশে যদি একটা বড় সরলরেখা টানো, তাহলে তো ওটা এমনিতেই ছোট হয়ে যায়!’

এটাই হলো সুস্থ প্রতিযোগিতা। যে জোরে দৌড়াতে পারে, ওকে পেছন থেকে টেনে ধরব না, ওর পথের মধ্যে এমন কিছু রাখব না, যাতে সে পড়ে যায়। আমাদের চিন্তাটা হওয়া উচিত এমন যে, সে দৌড়াচ্ছে দৌড়াক, তাকে থামানোর দরকার নেই, আগে যাওয়ার দরকার হলে একটু কষ্ট করে আমি ওর চেয়ে কিছুটা বেশি দৌড়াই। আরেকজন বড় হয়ে গেছে, তাকে কাটার দরকার নেই। স্রষ্টা আমার মধ্যে যে গুণ দিয়েছেন, আমি বরং সেটা কাজে লাগিয়ে বড় হওয়ার চেষ্টা করি।

এই প্রতিযোগিতাই পছন্দ করেন মহান স্রষ্টা। তাই কাউকে কোনোদিন কোনোভাবে মুছে ছোট করতে যেও না। কারো কীর্তিকে ছোট করতে যেও না। তাকে বরং সাহায্য করো এই বলে যে, তুমি আরো বড় হও।

সেই গল্পটা তো তোমরা সবাই জানো—বাংলার বারো ভূঁইয়াদের প্রধান ঈসা খাঁর সাথে মোঘল সেনাপতি মানসিংহের তরবারি যুদ্ধ চলছিল।

একসময় মানসিংহের তরবারি ভেঙে যায়। ঈসা খাঁ তখন অনায়াসে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পারতেন, হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা করলেন না, বরং প্রতিপক্ষকে আরেকটি তরবারি নেয়ার সুযোগ দিলেন। এই মহানুভবতার জন্যেই কিন্তু এত বছর পরও তার কথা আমরা মনে রেখেছি, তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। যে-কোনো প্রতিযোগিতায় তোমরাও এমন বড় মনের পরিচয় দেবে।

তোমাদের চেষ্টা থাকবে যে, নিজের গুণগুলোকে বিকশিত করে তোমরা আরো বড় হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে বড় হবে। সংগীতে বড় হবে। সাহিত্যে বড় হবে। শিল্পে বড় হবে। বাণিজ্যে বড় হবে। খেলাধুলায় বড় হবে। কিন্তু কাউকে কখনো ছোট করবে না। এটাই সত্যিকারের প্রতিযোগিতা। তাহলেই তোমাদের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে।’

কর্মস্থলে প্রতিযোগীকে
সবসময় শ্রদ্ধা করুন।
শক্তিশালী প্রতিযোগী
আপনার মেধার
সর্বোত্তম বিকাশে
অনুঘটক হিসেবে
কাজ করবে।



আনন্দময়
কর্মব্যস্ততা
বিষণ্ণতা রোধ করে



বিষণ্ণতাজনিত কারণে বছর কয়েক আগে আত্মহত্যা করলেন অস্কারজয়ী জনপ্রিয় মার্কিন কৌতুকাভিনেতা রবিন উইলিয়ামস। এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অবিশ্রান্ত চলছেই। এর পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিদ ও সংশ্লিষ্টদের কপালে দেখা দিয়েছে নতুন চিন্তার রেখা। হন্যে হয়ে সবাই খুঁজে ফিরছেন ক্রম-আত্মাসী বিষণ্ণতার কারণ এবং এটি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়।

টাইম ম্যাগাজিনের একটি সংখ্যায় বিষয়টি নিয়ে লিখেছেন খ্যাতনামা মার্কিন টিভি ব্যক্তিত্ব ডিক ক্যাভেট। *বল্লিং দ্য ব্ল্যাক ডগ* শীর্ষক নিবন্ধটিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, গত শতাব্দীর ব্রিটিশ রাজনীতিক ও প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বিষণ্ণতাকে অভিহিত করেছেন ব্ল্যাক ডগ বা কালো কুকুর হিসেবে।

ক্যাভেট লিখেছেন, শিল্পী-অভিনেতা-টিভি পারফর্মারদের মধ্যে বিষণ্ণতার আক্রমণ তুলনামূলক বেশি। যশ-খ্যাতি-পরিচিতি আর কাজের চাপ একপর্যায়ে তাদের মধ্যে কিছুটা একঘেয়েমির জন্ম দেয়। পাশাপাশি খ্যাতিরক্ষার স্নায়ুচাপ তো আছেই নিত্যসঙ্গী হয়ে। এ থেকে মুক্তি পেতে আর জীবনে কিছুটা বৈচিত্র্য আনতে কেউ কেউ ঝুঁকে পড়েন এলকোহল ও নেশার দিকে।

এলকোহল সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে করে তোলে আরো অবসন্ন ও ধীর। সৃষ্টি হয় এক ধরনের আবেগীয় ভারসাম্যহীনতা, প্রায়শই যা মানুষকে আত্মঘাতীপ্রবণ করে তোলে। সহসাই তখন সে ভুলে যায় জীবনসঙ্গী, সন্তান আর প্রিয়জনদের কথা। সবচেয়ে বেশি তুচ্ছ মনে হয় তার নিজের জীবনটাকেই। আত্মহত্যাই তখন তার কাছে হয়ে ওঠে একমাত্র সমাধান।

প্রয়াত রবিন উইলিয়ামসের সাথে কয়েক বছর আগে এক পার্টিতে সাক্ষাতের কথা স্মরণ করেছেন ডিক ক্যাভেট। সেদিন ক্লাবভর্তি দর্শককে অনেকক্ষণ ধরে বিস্তর হাসিয়ে মাতিয়ে রেখেছিলেন তিনি। অনুষ্ঠান শেষে ক্যাভেট তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে পরে উইলিয়ামস একটু বিমর্ষ হেসে বলেছিলেন, ‘সবাইকে এতক্ষণ হাসি-আনন্দে মাতিয়ে রাখলাম, কেবল

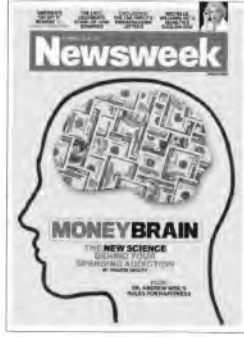
নিজেকে ছাড়া। অভিনেতাদের বাড়তি সুবিধাটা এখানেই-অন্যদের বিষণ্ণতাটা ধরা পড়ে যায়, কিন্তু আমরা জানি ওটা কীভাবে লুকিয়ে রাখতে হয়। বিষয়টা খুব মজার, তাই না?’

একসময় এমন কঠিনতর সময় পার করে এসেছেন ক্যাভেট্‌ নিজেও, নিজেই জানিয়েছেন সে-কথা। ভীষণ কষ্টের সেই সময়টিতে রীতিমতো হতবুদ্ধি আর দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এ অবস্থায় তিনি পাশে পেয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত অভিনেতা মার্লন ব্রাভো-কে। অসহায় ক্যাভেট্‌ তার কাছে সমস্যা খুলে বললে ব্রাভো পরামর্শ দিয়েছিলেন, ‘বিষণ্ণতা যতই তীব্র হোক, তোমার কাজটা তুমি করে যাও, তাতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করো, আনন্দ নিয়ে করো, ওতে ডুব দাও।’

আমি তা-ই করলাম। জোর করে চেষ্টা করলাম। আন্তে আন্তে ভালো বোধ হতে লাগল। চোখ-মুখ উজ্জ্বল হতে শুরু করল আমার। একাকিত্ব কেটে গেল। আমি নিজেকে খুঁজে পেলাম। ক্যাভেট্‌ বলছেন, এই ‘নিজেকে খুঁজে পাওয়াটা’ খুব জরুরি। আসুক যতই দুঃসময়, আমরা যেন নিজেকে হারিয়ে না বসি। যেন ভুলে না যাই-আমি কে? এই আত্মোপলব্ধিটাই পারে মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে। পারে সক্রিয় রাখতে।

উল্লেখ্য, গত কয়েক দশকে পৃথিবীজুড়ে, বিশেষত পাশ্চাত্যে, বেড়ে চলেছে নির্মম স্নায়ুঘাতী বিষণ্ণতার প্রকোপ। এ নিয়ে গবেষণা-অনুসন্ধান তাই চলছেই। সাম্প্রতিক একাধিক গবেষণার ফলাফলে বলা হচ্ছে-ওষুধ নয়, বরং ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি, মমতাময় পারিবারিক পরিবেশ, সুষম খাদ্যাভ্যাস, আনন্দময় কর্মব্যস্ততা, কাউন্সেলিং ও নিয়মিত মেডিটেশন বিষণ্ণতা প্রতিরোধ ও নিরাময় করে।

তথ্যসূত্র : টাইম, ২৫ আগস্ট ২০১৪



আজকের
সঞ্চয়
আপনার
আগামী দিনের
শক্তি



মানুষ হিসেবে আপনি কি সঞ্চয়ী, নাকি লাগামহীন খরচে? নতুন একজোড়া জুতা বা একটা আইফোন কেনা কিংবা বেড়ানোর সুযোগ পেলেই—হোক তা যতই ব্যয়সাপেক্ষ—আপনি কি অস্থির হয়ে ওঠেন? নাকি এসব ব্যাপারে আপাতত ক্ষান্তি দিয়ে ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের দিকেই আপনি বেশি মনোযোগী? তবে জেনে রাখুন, এ দু-ধরনের মানুষের মস্তিষ্কের গঠনে পার্থক্য কিছুটা আছে বটে।

একাধিক গবেষণার পর বিষয়টি এখন নিউরোসায়েন্টিস্টদের কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। তারা বলছেন, মানুষের সঞ্চয়-প্রবণতা আর বেগুন্মার খরচের ঝাঁক—এর পেছনে আমাদের মস্তিষ্কের কোন অংশটি কাজ করে, সে রহস্য এখন পুরোপুরিই বোধগম্য। বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের এ অংশটির নাম দিয়েছেন ‘মনি ব্রেন’।

গবেষকরা বলছেন, তাৎক্ষণিক আনন্দের বদলে যারা ভবিষ্যৎ-সুখের জন্যে অপেক্ষা করতে পারেন এবং আগামী দিনের জন্যে সঞ্চয় করতে পারেন, তাদের মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সটি তুলনামূলক বেশি কার্যকর। উল্লেখ্য, মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স আমাদের সুখ ও আনন্দের মতো ইতিবাচক আবেগ-অনুভূতিগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্যে নিউরোসায়েন্টিস্টরা একটি গবেষণা চালিয়েছিলেন, যেখানে একদল স্বেচ্ছাসেবকের মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সকে শক্তিশালী চুম্বকের মাধ্যমে স্তিমিত করে রাখা হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এর ফলে তাদের মধ্যে খামখেয়ালিপনা, উদাসীনতা, অযাচিত খরচের প্রবণতা বেড়ে গেছে।

পরবর্তীতে এদের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সকেই আবার কৃত্রিম উপায়ে উদ্দীপিত করে দেখা গেছে, ক্ষণিক আনন্দে মাতোয়ারা না হয়ে তারা দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী হয়েছেন এবং আগের চেয়ে তুলনামূলক বেশি ধৈর্যধারণ করতে পারছেন।

এ চুম্বক গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই কিছু ক্রনিক ব্যথা, মাত্রাতিরিক্ত বিষণ্ণতা, সিজোফ্রেনিয়াসহ আরো কিছু মনোদৈহিক অসুস্থতার সফল চিকিৎসা করতে সমর্থ হয়েছেন।

আছে মনছবিরও ভূমিকা

সঞ্চয়ী আর খরচ-এদের ব্যক্তিত্বের ধরনেও আছে তফাৎ। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসায়েন্টিস্ট পল গ্লিমশার বলেন, সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহ যাদের কম, তারা যে বোকা আর যুক্তিহীন তা নয়; কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, সঞ্চয় না করার যে ভবিষ্যৎ পরিণতি সেটা তারা পরিস্কারভাবে বুঝতে পারেন না। তার মতে, এটি আসলে আপেক্ষিক। অর্থাৎ কারো কাছে আজকের আনন্দটা গুরুত্বপূর্ণ, কারো কাছে আবার প্রাধান্য পায় ভবিষ্যতের আনন্দটুকু।

একটি গবেষণার অংশ হিসেবে একদল স্বেচ্ছাসেবককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল-১০০ ডলার কি আপনি আজই চান নাকি পরের সপ্তাহে? এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে যখন তারা চিন্তা করছিলেন, ঠিক সে-সময় ওদের এমআরআই করে দেখা গেছে, মস্তিষ্কের যে অংশটি এ-জাতীয় চিন্তার সাথে সংশ্লিষ্ট, সেটি যাদের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি উদ্দীপ্ত তারা পরবর্তী সপ্তাহ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারেন। অন্যদিকে এটি কম উদ্দীপ্ত হয় যাদের, তাদের কাছে ভবিষ্যৎ-সুখের বিষয়টি তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয় এবং সবকিছুই তারা চান তৎক্ষণাৎ, এ মুহূর্তেই।

তাহলে সবাই কি এমন ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারবেন না, যাতে ভবিষ্যতের সঞ্চয়টা আরো পোক্ত হয়? আছে, সে উপায়ও আছে। তা হলো, ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির আনন্দ-অনুরণন যদি সচেতনভাবে ভেতরে অনুভব করা যায়, তবে মস্তিষ্কের সেই অংশটি ঠিকই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং তখন সঞ্চয় করাও হয় সহজ। (এ যে মনছবির কথাই বলা হচ্ছে!)

সবর বা ধৈর্য ৯

সাফল্য ও প্রশান্তির পূর্বশর্ত

১৯৬০ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজিস্ট ওয়াল্টার মিশেল একটি চমৎকার গবেষণা পরিচালনা করেন। *মার্শম্যালো এক্সপেরিমেন্ট* খ্যাত এ গবেষণায় তিনি চার বছরের একদল বাচ্চাকে বলেছিলেন, তোমরা প্রত্যেকে একটি করে মার্শম্যালো (এক ধরনের ক্যান্ডি) পাবে, কিন্তু এখন না নিয়ে যদি কিছুক্ষণ পরে নাও তবে পাবে দুটো করে।

এক দশকেরও বেশি সময় পরে দেখা গেছে, যেসব বাচ্চারা সেদিন দুটো মার্শম্যালোর জন্যে অপেক্ষা করতে পেরেছিল, পরবর্তীতে একাডেমিক

পরীক্ষার ফলাফল ও স্যাট-স্কোরসহ অনেক বিষয়েই তারা তুলনামূলক ভালো করেছে।

মিশেলের মতে, এটাই প্রমাণ করে যে, বর্তমানের চাহিদাটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ভবিষ্যৎ-সুখের জন্যে অপেক্ষা করার সংহত শক্তিটুকু যদি আপনার মধ্যে থাকে অর্থাৎ আপনি যদি ধৈর্য ধরতে পারেন, তবে আপনার আবেগ ও বুদ্ধিমত্তা ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয় এবং এর সাথে সাফল্যের একটি চমৎকার যোগসূত্রও রয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, এদের মধ্যে পরবর্তীকালে মেদস্থূলতা, মাদকের প্রতি আসক্তি, বিবাহ-বিচ্ছেদের হারও তুলনামূলক কম ছিল। অন্যদিকে ‘এক্ষুণি চাই, এইমাত্র চাই’ মনোভাব যাদের, তাদের ক্ষেত্রে এমন নেতিবাচক পরিণামের হার ছিল বেশি।

সবই সম্ভব, থাকে যদি প্রাণান্ত প্রয়াস

স্মৃতিশক্তি যাদের ভালো এবং যারা ভবিষ্যতের বাস্তবতাটা কল্পনা করতে পারেন, তাদের ক্ষেত্রেও সঞ্চয়-প্রবণতা তুলনামূলক বেশি। ভার্জিনিয়া টেক-এর সাইকোলজিস্ট ওয়ারেন বিক্ল বলেন, এ ধরনের মানুষেরা ভবিষ্যতের প্রয়োজন আগে থেকেই বুঝতে পারে এবং ক্রমাগত অভ্যাসের পথ ধরে এটি আয়ত্ত করা সম্ভব বলে জানান বিক্ল।

তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে মাত্র এবং এ-যাবৎ যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। মার্শম্যালো গবেষণায় যেসব শিশু প্রথমদিকে অপেক্ষা করতে পারত না, কিন্তু তারাই যে আবার পরবর্তী জীবনে পরীক্ষা এবং অন্যান্য কাজে গবেষণার স্বাক্ষর রেখেছে তা-ও নিরন্তর চর্চা আর অভ্যাসের ফলেই।

গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুদের যদি উদ্বুদ্ধ করা যায়, তবে ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে তারাও নিজেদের ধৈর্যশক্তি ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে; সেইসাথে অর্জন করে বড় কিছু অর্জনের লক্ষ্যে ক্ষণিকের ছোট আনন্দকে ত্যাগ করার শক্তি।

মমতার বন্ধন হোক দৃঢ়

অবাক মনে হলেও সত্যি যে, মমতার ভূমিকাও এ-ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মানবদেহের অক্সিটোসিন হরমোনটি পরিচিত ‘লাভ হরমোন’ নামে। এটি মানুষের প্রেম ও মমতার বন্ধনকে দৃঢ় করে। গবেষকরা দেখেছেন,

মমতাপূর্ণ সম্পর্কের বাঁধনে যারা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুখী, তারা সঞ্চয়ও করতে পারে বেশি।

এর কারণ হিসেবে তারা বলছেন, মমতা জীবন থেকে স্ট্রেসকে দূরে সরিয়ে রাখে। অন্যদিকে স্ট্রেস সবসময়ই মানুষকে তাৎক্ষণিক আনন্দ, ভোগ ও লাগামহীন খরচের দিকে ঠেলে দেয়। আর স্ট্রেসমুক্তির জন্যে মেডিটেশনের ভূমিকা তো বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

সন্তান লালনে চাই সঠিক জীবনদৃষ্টি

প্যারেন্টিং বা সন্তান লালনপালনের বিষয়টিও এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। যেসব মা-বাবা সন্তানদের অতিরিক্ত আদর-আহ্বাদ দেয়ার পাশাপাশি ‘চাহিবা মাত্রই’ সবকিছু দিয়ে দেন, পরবর্তী জীবনে কোনোকিছু পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করার মনোভাব সেসব সন্তানদের আর থাকে না, সঞ্চয়ের ব্যাপারেও তারা হয় বেশ উদাসীন।

বলা হচ্ছে, এটি সাধারণত ঘটে সেসব মা-বাবার ক্ষেত্রে, যারা উভয়েই সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকেন। সে-ক্ষেত্রে সন্তানকে প্রয়োজনীয় সময় দিতে না পারার ক্ষতটুকু তারা পুষিয়ে দিতে চান হরেক রকমের উপহার দিয়ে এবং সন্তান যা চায় তা-ই তারা দিয়ে দেন বিনা বাক্যব্যয়ে।

ফলে জীবনের শুরু থেকে সন্তান সবসময় চাওয়ার সাথে সাথে পেতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, অপেক্ষা করতে শেখা হয়ে ওঠে না তাদের। এজন্যে গবেষকদের পরামর্শ হলো, সন্তান লালনপালনে জীবনের শুরু থেকেই চাই সঠিক জীবনদৃষ্টি।

তথ্যসূত্র : নিউজউইক, ৭ নভেম্বর ২০১১



চাই আশা

আশাই জীবনের মূল
চালিকাশক্তি

দুই বন্ধুতে গল্প হচ্ছে।

একজন বলছে : সভ্যতার এই অভাবনীয় অগ্রগতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আজকের যে অভূতপূর্ব উত্থান, এর মূলে রয়েছে আশাবাদী ও নৈরাশ্যবাদী দুদলেরই সমান অবদান। অন্যজনের উৎসুক প্রশ্ন : আশাবাদীদের ভূমিকা আছে তা তো বুঝলাম, কিন্তু নৈরাশ্যবাদীর ভূমিকাটা কেমন? প্রথমজনের উত্তর : আছে, নৈরাশ্যবাদীদের কৃতিত্বও আছে বৈকি—আশাবাদীরা ছিল বলে এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নৈরাশ্যবাদীরা ছিল বলেই তো আবিষ্কৃত হয়েছে প্যারাসুট!

পাঠক, জোকসটা পড়ে নিশ্চিত হেসে নিয়েছেন জানি। কিন্তু একটু ভাবুন তো, প্যারাসুট যিনি আবিষ্কার করেছেন, আসলেই কি তিনি নৈরাশ্যবাদী, নাকি বরং আশাবাদের দিক থেকে আরো একধাপ এগিয়ে? বাঁচার আশা তীব্র বলেই না প্যারাসুট আবিষ্কারের কথা তিনি ভেবেছেন—এরোপ্লেন দুর্ঘটনা-কবলিত হলেও যাতে বাঁচার একটা উপায় অন্তত থাকে। তাহলে এদের আর নৈরাশ্যবাদী বলে গাল দেয়ার অধিকার আছে কার?

আসলেই তা-ই। আমাদের চারপাশের মানুষ-যাদের আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি, যাদের সাথে আমাদের নিত্যদিনের ওঠা-বসা, তাদের সবাই-ই আসলে কমবেশি আশাবাদী। আশা নিয়েই তো আমাদের বেঁচে থাকা। একজন মানুষ বেঁচে আছেন, তার জীবন আছে, কাজকর্ম করছেন মানেই তার আশা আছে। কারণ আশাই জীবনের মূল চালিকাশক্তি। আশা ছাড়া জীবন নেই। জীবন মানেই আশা।

এই আশা হয়তো কারো মধ্যে দৃশ্যমানভাবে বেশি, কারো মধ্যে হয়তো-বা কম কিংবা খানিকটা ঝিমিয়ে গেছে। যিনি উদ্যমে সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত, তাকে আমরা আশাবাদী বলে বাহবা দিচ্ছি; আর যার মধ্যে এর প্রকাশটা তুলনামূলক কম, তাকে আশাহীন কিংবা নৈরাশ্যবাদী আখ্যা দিয়ে কার্যত আরো সেদিকেই ঠেলে দিচ্ছি।

যদিও হওয়া উচিত ছিল এর উল্টোটা—তাকে একটু বুঝিয়ে, উৎসাহিত করে বা আর কিছু না-হোক, নিতান্তই একটু পিঠ-চাপড়ে সাহস দেয়া, একটুখানি শক্তি যোগানো। ধর্ম আর মহামানবদের শিক্ষা তো আমাদের তা-ই বলে।

আর একজন মানুষকে নৈরাশ্যবাদী বলিই বা কী করে? যিনি বেঁচে আছেন, পরের মুহূর্তটিতেও বেঁচে থাকার জন্যে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন (ইচ্ছে করলে এটা বন্ধের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তও তো তিনি করতে পারতেন। যারা এটা করে, তাদের আশা বোধহয় শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকে বলেই তা করে), খাওয়াদাওয়া করে শক্তি সঞ্চয় করছেন, পড়াশোনা করছেন বা পেশাগত দৈনন্দিন কাজকর্ম করছেন—তাকে আর যা-ই হোক, ‘নৈরাশ্যবাদী’ বলে আখ্যা দেয়াটা অযৌক্তিকই বটে।

কারণ জীবন আর আশা সমার্থক। জীবন আছে, তার মানে আশা হারিয়ে যায় নি। সে আশা হতে পারে পড়াশোনা বা কর্মক্ষেত্রে আরাধ্য সাফল্যের, স্বপ্ন পূরণের বা বৈষয়িক সমৃদ্ধির। অর্থাৎ আশা আছেই—হতে পারে কম কিংবা বেশি। আমাদের কাজ এখন একটাই—চিরন্তন এ আশার শক্তিকেই আরো বাড়িয়ে তোলা, নিজেদের আশার সলতেটাকে একটু ভালো করে জ্বালিয়ে নেয়া—যাতে সাফল্য আর আনন্দময় জীবনের দিকে পথচলা হয় সহজ। এবং তা সম্ভবও।

কেনই-বা আমাদের আশা আর উদ্যমে ভাটা পড়ে? প্রতিদিনকার নানা স্ট্রেস বা টেনশন অস্থিরতা ভয় আলস্য দীর্ঘসূত্রিতা এবং মূলত নেতিবাচক জীবনদৃষ্টিকে এর অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। মূলত এসবই একজন মানুষের ভেতরের উদ্যম ও চিরায়ত আশার বোধটিকে ক্রমশ দুর্বল করে দেয়, পরিণত করে তথাকথিত নৈরাশ্যবাদী মানুষে।

মুক্তির উপায়? ধরা যাক, ঘুটঘটে অন্ধকার একটি ঘর, আলোর লেশমাত্র সেখানে নেই। এখন এ ঘরটিতে কেন আলো নেই, কীভাবে আলো নিভে গেল, কীভাবে আবার আলোকিত করা যায়, ঘরটি আলোকিত করতে কত আলো প্রয়োজন এবং কীভাবে তার যোগাড় হবে—এসব নিয়ে নানা আলোচনা, মিছিল-মিটিং, বৈঠক-সভা-সমিতি (প্রয়োজনে তদন্ত কমিটিও) করা যেতে পারে। কিন্তু আবার এটাও সত্য যে, এতকিছু না করে একটি মোমবাতি জ্বেলে দিলেই ঘরটি পুনরায় আলোকিত হয়ে উঠতে পারে।

জীবনঘাতী নেতিবাচকতা আর নৈরাশ্যবাদীতার বৃত্ত থেকে এক ঝটকায় বেরিয়ে আসার সহজ পথও এমন একটাই—তা হলো, কাজে নেমে পড়ুন। টেনশন অস্থিরতা ভয় আলস্য দীর্ঘসূত্রিতা—আপনার মধ্যে যা-ই থাকুক না কেন, এসব কীভাবে তাড়াবেন বা ঠেকাবেন সে চিন্তা পরে হবে। যা আছে, যেটুকু শক্তি আর সক্ষমতা আপনার আছে তা নিয়ে আগে কাজে নেমে পড়ুন। শ্রমানন্দময় কাজ—যেখানে কাজের আনন্দ আছে, বেঁচে থাকার

আনন্দ আছে, দেয়ার আনন্দ আছে, সেবার আনন্দ আছে—যত স্বল্প আর ক্ষুদ্র পরিসরেই তা হোক।

প্রশ্ন করে বসতে পারেন, শুধু কাজ কীভাবে একজন মানুষকে আশাবাদী করে তুলতে পারে বা তার আশার শক্তিকে বাড়িয়ে দিতে পারে? অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদেব খুব সুন্দর একটি কথা আছে—‘কাজ হচ্ছে গঙ্গাজল। কাজের মধ্যে থাকলে পরে ক্লেশ, গ্লানি, বিষণ্ণতা, হতাশাসহ সমস্ত নেতিবাচকতা ধুয়ে-মুছে একজন মানুষ হয়ে ওঠেন ঝকঝকে, তকতকে আর নির্মল। আক্ষরিক অর্থেই তিনি হয়ে ওঠেন সুস্থ দেহ আর প্রশান্ত মনের অধিকারী। তার জীবনের পরতে পরতে তখন থাকে শুধু আশা, আশা আর আশা—যা বাড়িয়ে দেয় তার উদ্যম ও কর্মস্পৃহা। ফলে সাফল্যও আসে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায়।’

কারণ কাজের নিজস্ব একটি শক্তি আছে, যা একটি ইতিবাচক বৃত্ত সৃষ্টি করে। এ বৃত্ত আশার, এ বৃত্ত উদ্যমের, এ বৃত্ত শ্রমানন্দের। আর সে কাজ যদি হয় মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত, তবে একটা আলোকিত আনন্দময় জীবনই তো তার প্রাপ্য।

শ্রমানন্দময় কর্মপ্রচেষ্টার পাশাপাশি নিজের অন্তর্গত আশাবাদ ও ইতিবাচকতার ভিত্তিকে আরো সংহত করে তুলতে জীবন থেকে নেতিবাচক সমস্ত কথা, আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি সচেতনভাবে পরিহার করণ। নিজেকে ক্রমাগত আশা ও ইতিবাচকতার কথা শোনার। দিনে অন্তত শতবার বলুন, সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন। তাহলে আপনার মস্তিষ্ক আপনাকে সেভাবেই পরিচালিত করবে এবং আপনি নিজেই হয়ে উঠবেন অমূল্য এ বাণীর একজন অনন্য ও সার্থক উদাহরণ।



সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য
জীবনকে
সুখী করে
সুস্থ রাখে
শরীর-মন



“জীবনে যার বেঁচে থাকার একটা ‘কারণ’ আছে, জীবনটা তার জন্যে অনেক সহজ।” উনিশ শতকের জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নীটশের কথা এটি। এরপর দু-শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, কিন্তু হালের মনোবিদ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের বহু গবেষণালব্ধ ভাষ্য আজও ঠিক সেটাই, তা হলো, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য মানুষকে সুখী ও দীর্ঘায়ু করে। শরীর-মনকে রাখে সুস্থ ও প্রাণবন্ত। বাড়িয়ে তোলে তার কর্মক্ষমতা।

চলুন খুঁজে দেখা যাক কী তার রহস্য।

লক্ষ্যই জীবনের মূল চালিকাশক্তি

জীবনের এক প্রবাসত্য এ বাক্যটি। জীবন গতিময় হয়ে ওঠে লক্ষ্যকে অনুসরণ করেই। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য জীবনে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। সুদীর্ঘ গবেষণার ফলাফলে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, যারা বেঁচে থাকেন একটা লক্ষ্যকে ঘিরে, তারা লাভ করেন দীর্ঘজীবন। ঘুম ভালো হয় তাদের। স্ট্রোক ও বিষণ্ণতার ঝুঁকি থেকে তারা মুক্ত থাকেন। অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় সূচকেও তাদের অবস্থান অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক ভালো।

গবেষকদের মতে, লক্ষ্যাভিসারী মানুষেরা যে-কোনো আসক্তি কাটিয়ে উঠতে পারেন দ্রুত। আছে আরো আরো বিস্ময়কর তথ্য-রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে তারা অগ্রণী। চিকিৎসকরা বলছেন, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো যদি এ দাওয়াইটা কোনোভাবে বোতলজাত করতে পারত তবে ওদের বিলিওনিয়ার হওয়া আর ঠেকাত কে!

লক্ষ্য কীভাবে জীবনের গতিধারাকে প্রভাবিত করে, দেহ-মনে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করে-এ নিয়ে প্রথম গবেষণা শুরু করেন অস্ট্রিয়ান মনোবিদ ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইহুদি নিধনযজ্ঞ থেকে বেঁচে ফেরা একজন কিংবদন্তী স্নায়ু-চিকিৎসক তিনি।

নাৎসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বন্দি দিনগুলোতে ভিক্টর অন্যান্য সহবন্দিদের পর্যবেক্ষণ করতেন। তখন তিনি দেখেছেন, অবিরাম নির্যাতন আর দুর্ভোগে যারা বোধশক্তি হারিয়ে বসেছিল, সামনে কোনো আশা দেখতে পাচ্ছিল না, খুঁজে পাচ্ছিল না বেঁচে থাকার কোনো উদ্দেশ্য, তারা

দ্রুত নিঃশেষ হয়ে পড়ছিল এবং একসময় জীবন থেকে পুরোপুরিই হারিয়ে গিয়েছিল ওরা। পরবর্তীতে ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল এসব বিষয় নিয়েও বিস্তারিত লিখেছেন এবং বিশ্বযুদ্ধের পর নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন ‘জীবনে লক্ষ্যের প্রভাব’ সংক্রান্ত গবেষণায়।

লক্ষ্য মানুষকে বদলে দেয় কমায় রোগঝুঁকি, রাখে সুস্থ

গবেষকরা এখন লক্ষ্যকে সংজ্ঞায়িত করছেন জীবন বদলের অনুঘটক হিসেবে। তারা বলছেন, লক্ষ্য হতাশা দূর করে। জীবনে আনে সম্ভ্রষ্টি। মানুষকে বদলে দেয় ভেতর থেকে। তার দৈনন্দিন আচরণ-অভ্যাসে সূচিত হয় দৃশ্যমান পরিবর্তন। সবমিলিয়ে বলা যায়, জীবনে সুখী হওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্যের রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

বয়স, পেশা, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে স্বাস্থ্যের ওপর লক্ষ্যের ইতিবাচক প্রভাব সবিশেষ লক্ষণীয়। ১০ বছরের ধারাবাহিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, লক্ষ্য-সচেতন মানুষেরা নিয়মিত ব্যায়াম ও সুস্থ খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি সঠিক জীবনাচার অনুসরণে এবং মাদকাসক্তির মতো বদভ্যাস বর্জনে অনেকাংশে আন্তরিক। এর পাশাপাশি ঘুম-সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে এবং জীবনের অন্যান্য স্বাভাবিক আনন্দ উদযাপনে এরা অধিকতর সক্ষম।

১৬ হাজার মধ্যবয়সী মার্কিন ও ব্রিটিশ নাগরিকের ওপর পরিচালিত দুটি ভিন্ন ভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এদের মধ্যে যারা নিজ লক্ষ্যের ব্যাপারে যত সচেতন ছিলেন—রোগ ও অন্যান্য কারণে তাদের মৃত্যুহার তত কমেছে। হৃদরোগের ঝুঁকি কমেছে ২৭ শতাংশ, স্ট্রোকের ২২ শতাংশ, বয়সজনিত স্মৃতিভ্রম আলঝেইমার্সের ঝুঁকি নেমে এসেছে অর্ধেক।

লক্ষ্য আক্ষরিক অর্থেই ধন্বন্তরি। একাধিক গবেষণায় প্রমাণিত এটি। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক প্যাট্রিক হিলের মতে, লক্ষ্য-সচেতন মানুষের জীবনে আয় ও প্রাচুর্যের সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি।

লক্ষ্য-সচেতনতা জীবনকে অর্থবহ করে নার্ভাস সিস্টেমকে করে সংহত

লক্ষ্য মানুষকে কর্মোদ্যমী করে। তাকে উজ্জীবিত করে কর্তব্যবোধে। জীবনকে করে তোলে অর্থবহ। এ নিয়ে আশ্চর্য তথ্য দিচ্ছেন ভার্জিনিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শিগেহিরো ওশি। ১৩২টি দেশের এক লক্ষ ৪১ হাজার নাগরিকের ওপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফলে তিনি বলছেন, ধনী দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের নাগরিকেরা এদিক থেকে এগিয়ে আছেন। ধনী দেশগুলোতে বছরকম সম্ভাব্য সুযোগের সামনে একজন মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাষিত হন, তুলনায় দরিদ্র দেশের মানুষের কাছে সেটি অধিকতর স্পষ্ট। ফলে এরা সহজেই বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পান।

আর লক্ষ্যহীন জীবনে বাঁচার কোনো অর্থ খুঁজে না পেয়ে হা-হুতাসে যারা অস্থির, তাদের জন্যে দুঃসংবাদ। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক স্টিভেন কোল বলেন, একাকিত্ব ও এর ফলে সৃষ্ট স্ট্রেস মানবদেহের জিনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা দেহে রোগ-প্রতিরোধী অ্যান্টিবডি'র কাজকে ব্যাহত করে, বাড়ায় হৃদরোগ, আলঝেইমার্স ও ক্যান্সারের ঝুঁকি।

লক্ষ্য-সচেতনতা দেহের নার্ভাস সিস্টেমকে সংহত করে। ফলে উদ্ভূত কোনো পরিস্থিতি ও বিপদে দেহে এড্রিনালিন নিঃসরণের পরিমাণ কমে এবং হার্ট রেট ও শ্বাসপ্রশ্বাস থাকে নিয়ন্ত্রণে। কমে স্ট্রেসজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি।

মস্তিষ্ক ও জিনের সুস্থতার জন্যে চাই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও মেডিটেশন চর্চা

মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ভেন্ট্রাল স্ট্রিয়াটাম। বিজ্ঞানীরা বলছেন, লক্ষ্য-সচেতন মানুষের ক্ষেত্রে এটি থাকে অধিকতর সক্রিয়, যা দেহ-মনে নির্মল সুখানুভূতি সৃষ্টি করে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সুখপ্রদ চিন্তাভাবনাও মস্তিষ্কের এ অংশের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। কমায়ে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসোলের প্রভাব।

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যে মানুষকে সুস্থ রাখে, তার আরেকটি প্রমাণ মিলেছে জিনবিজ্ঞানীদের গবেষণায়। প্রতিটি দেহকোষে থাকে ক্রোমোজম, এর প্রান্তভাগে রয়েছে টুপিসদৃশ 'টেলোমেরার', যা ডিএনএ-কে সুরক্ষা দেয়। আর এই টেলোমেরারের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে আমাদের দীর্ঘায়ু। কিন্তু বয়স ও স্ট্রেসের ফলে টেলোমেরারের দৈর্ঘ্য কমতে থাকে অর্থাৎ কমে দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা। তবে গবেষকদের মতে, লক্ষ্য-সচেতনতা ও মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে এর গতিরোধ সম্ভব। সমমর্মী হৃদয়ে অন্যের কল্যাণচিন্তাও এ-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর বলে জানান তারা।

এসব বিবেচনায় গবেষকদের পরামর্শ হচ্ছে, জিডিপি ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মতো ‘জীবনে লক্ষ্য-অনুসারী হওয়ার’ শিক্ষাটিও পাবলিক পলিসি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষক মাইকেল স্টেগার বলেন, ‘এটা করা হলে দেশে চিকিৎসাব্যয় ও অকালমৃত্যুর হার কমবে, সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যের মানোন্নয়ন ঘটবে।’

লক্ষ্য-সচেতন হোন ॥

প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য সাফল্য আপনার

আপনিও লক্ষ্য-সচেতন হোন। আপনার ব্যক্তিগত জীবন পরিবার পেশা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ-সবগুলো দিকই স্বচ্ছন্দ ও গতিময় হয়ে উঠবে আপনার লক্ষ্যকে ঘিরে। প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য সাফল্যের পথে বহুধাপ এগিয়ে থাকবেন আপনি।

এ ব্যাপারে স্টেগার-এর পরামর্শ হলো, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন, তারপর তা অনুসরণ করে ছোট ছোট পদক্ষেপে ক্রমাগত এগিয়ে যান।

লক্ষ্য নিরূপণের চিরায়ত এক উপায় বাতলে দিয়েছেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-গবেষক ও লাইফ অন পারপাস গ্রন্থের লেখক ভিক্টর স্ট্রেচার। তার পরামর্শ-‘ভাবুন পৃথিবীতে আপনার শেষ দিনটির কথা, শবদাত্রায় লোকের মুখে কী শুনতে চান নিজের সম্পর্কে? কিংবা ওদের জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি বেঁচে থাকতে চান এক অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে? এ থেকেই বুঝে নিতে পারেন কী হওয়া চাই আপনার লক্ষ্য।’ (সিকি শতাব্দী ধরে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অনুষ্ঠিত জীবনছবি মেডিটেশনের হুবহু চিত্রকল্প যেন!)

মনোবিদরা বলছেন, এ অনন্য কল্পনা মানুষকে মুক্তি দেয় জীবনের অর্থহীনতা ও বিষণ্ণতার আক্রমণ থেকে। আর পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের সামনে স্থাপন করে অসামান্য এক দৃষ্টান্ত।

প্যাট্রিক হিলের মতে, ‘বয়স আপনার যা-ই হোক, ২০ কিংবা ৭০, জীবনের লক্ষ্যটা একবার মনে গাঁথা হয়ে গেলে এর প্রভাব আপনার শরীর মনে স্পষ্টতই অনুরণিত হবে। আর এ কল্পনা হয়ে উঠবে আপনার চিরপ্রেরণার উৎস। তাই অবসরের পরও থাকুন লক্ষ্যগামী ও কর্মব্যস্ত-মানুষের কল্যাণে, সমাজের উন্নয়নে।’

আপনার সন্তানকে জীবনের লক্ষ্য দিন

২০১৫ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ ধ্যানসন্ধ্যা। এতে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের আলোচনার মূল বিষয়টিই ছিল জীবনের লক্ষ্য। তিনি বলেন, ‘পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারা-র ১৪৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, *প্রত্যেকেরই একটি লক্ষ্য আছে; যা তার কর্মধারাকে পরিচালনা করে। ...* অর্থাৎ একজন মানুষের লক্ষ্যই তার জীবনকে পরিচালিত করে। লক্ষ্য অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হয় তার যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা ও জীবনধারা।

অন্যদিকে, যার কোনো লক্ষ্য থাকে না, সে জানে না-সে কী করবে, কোথায় যাবে, কেন যাবে। বুঝতে পারে না তার কী করা উচিত। লক্ষ্যহীন মানুষ তাই শেষপর্যন্ত কোথাও পৌঁছায় না। একপর্যায়ে সে হয়ে পড়ে হতাশ ও নেতিবাচক। তখন নানারকম বিভ্রান্তি এসে ভর করে তার জীবনে। এমনকি লক্ষ্যহীন মানুষ জড়িয়ে যেতে পারে বিভিন্ন জীবনঘাতী আসক্তিতে। কিন্তু একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য মানুষকে করে তোলে আত্মবিশ্বাসী, সাহসী ও ইতিবাচক।

তাই জীবনের শুরু থেকেই আপনার সন্তানকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দিন। তাকে উজ্জীবিত করুন একটি কল্যাণকর স্বপ্নে। নবীর পুতুল নয়, শ্রমসহিষ্ণু করে তাকে গড়ে তুলুন। সন্তানের জীবনে মা-বাবার কাছ থেকে এটাই হলো সবচেয়ে বড় উপহার।

আমরা সবসময়ই বিশ্বাস করি, কোনো মানুষই কারো চেয়ে ছোট নয়, হীন নয়। স্রষ্টা সব মানুষকেই তার প্রতিনিধি হিসেবে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও মেধা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। চাই শুধু এ সুত্ত জ্ঞান ও মেধাকে বিকশিত করা। আর একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং সে-পথে অবিচল কর্মপ্রচেষ্টাই পারে তার সমস্ত মেধা যোগ্যতা জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়ে কাজিফত সাফল্য এনে দিতে।

মূলত এ বিশ্বাস থেকেই দেড় দশক আগে আমরা বান্দরবানের লামায় দেশের সবচেয়ে দরিদ্র বঞ্চিত দুস্থ পরিবারের সন্তানদের নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। ওখানে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের আমরা শুরু থেকেই একটি বড় স্বপ্নে ও লক্ষ্যে প্রাণিত করেছি যে, তুমিও পারবে। একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে সেটি অর্জনের জন্যে প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাও। তুমি প্রথম হবে। সফল হবে তুমিও।

ওরা পেরেছে। লক্ষ্য-সচেতনতার পাশাপাশি ওরা একাত্মভাবে বিশ্বাস করেছে, যে-কোনো সাফল্য অর্জনের শক্তি ও সম্ভাবনা তাদেরও রয়েছে। পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতার পথ ধরে তারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে গেছে। পড়াশোনা, খেলাধুলা, সংস্কৃতিচর্চা সব দিকে ওদের নিয়মিত ও ধারাবাহিক সাফল্যই তার প্রমাণ। এটি সম্ভব হয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও স্বপ্নকে সামনে রেখে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ফলে।

তাই আপনার সন্তানকে বাড়ি গাড়ি ব্যাংক-ব্যালেন্স নয়, বরং প্রথম থেকেই তাকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে উদ্বুদ্ধ করুন। ইতিবাচকতা, স্বপ্ন ও আত্মবিশ্বাস দিন। প্রাকৃতিক নিয়মেই এটি তার জীবন ও কাজকে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করবে। আর এটাই হবে আপনার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্যে সর্বোত্তম উপহার।’

তথ্যসূত্র : নিউ সায়েন্টিস্ট, ২৮ জানুয়ারি ২০১৭

মনছবি শুরু হয় শূন্য থেকে,
শেষ হয় পূর্ণতায়।



প্রশান্তি
ও দীর্ঘজীবনের জন্যে
মেডিটেশন করুন
ইতিবাচক হোন



আজকে যে বেপরোয়া বিচ্ছিন্ন/ শান্ত সুবোধ হবে কাল সে,/ চোখের সঙ্গী হবে চশমা/ চল্লিশ পেরোলেই চালশে। শান্ত সুবোধ হতে কিছুমাত্র দোষ নেই, কিন্তু চল্লিশ পেরোতেই চালশে? এ-ই কি নিয়তি? আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, এটা অবধারিত নয়। নিয়মিত মেডিটেশনের মাধ্যমে প্রশান্ত জীবনযাপন, ব্যায়াম, বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস এবং আশাবাদী ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বার্ষিক্যগতিকে বিলম্বিত করে। অর্থাৎ আয়ু বাড়ায়। দীর্ঘদিন যাবৎ একজন মানুষ থাকতে পারেন মনোদৈহিকভাবে সজীব, উচ্ছল, কর্মময়।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, আপনার মুড, অনুভূতি, চিন্তাভাবনা সবকিছুই প্রভাবিত করে আপনার শরীর ও শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমকে। তাই স্বাস্থ্যগবেষকদের পরামর্শ হলো, দেহ-মনে শিথিল হতে শিখুন। তাতে আপনার রক্তচাপ থাকবে স্বাভাবিক, বিষণ্ণতা-হতাশার মতো নেতিবাচক অনুভূতিগুলো হ্রাস পাবে। দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হয়ে উঠবে আরো সংহত ও কার্যকর।

তা-ই নয় শুধু, হাড়ের গঠন মজবুত ও হাড় সুরক্ষা, করোনাবিহীন হৃদরোগ নিরাময় এবং বয়সজনিত নিউরোন-ক্ষয় প্রতিরোধেও মনের আছে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। গবেষকরা তাই বলছেন, আপনি আসলে ততটাই বৃদ্ধ, যতটা আপনি নিজেকে মনে করেন।

মেডিটেশন ও ইতিবাচকতা দেবে দীর্ঘজীবন

মেডিটেশনের উপকারিতা বিস্তৃত জীবনের সর্বক্ষেত্রজুড়েই—এ বিষয়টি আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী ও গবেষক মহলেই শুধু স্বীকৃত নয়, বরং সর্বসাধারণে ব্যাপকভাবে গৃহীত ও নানাভাবে পরীক্ষিত একটি সত্য। তাই এ নিয়ে উত্তরোত্তর গবেষণার অন্ত নেই সারা পৃথিবীজুড়েই। ফলে প্রতিনিয়তই আমরা জানতে পারছি মেডিটেশনের আরো নতুন নতুন কার্যকারিতা ও উপযোগিতার আশাপ্রদ খবর।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজির প্রফেসর এলেন ল্যান্ডার। গত প্রায়

৪০ বছর ধরে তিনি বার্ষিক্যের সাথে মনের সংযোগ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, যখন আমরা আমাদের মনের যত্ন নিই তখন মূলত শরীরেরই যত্ন নিই। কারণ শরীর চলে মনকে অনুসরণ করেই। এ দুটো আলাদা কোনো সত্তা নয়। আর এটা যখন আপনি উপলব্ধি করবেন তখন মেডিটেশন, আশাবাদ, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক যোগাযোগের মতো জীবন-অভ্যাসগুলো অনুসরণ করা আপনার জন্যে হবে অনেক সহজ, যা শেষপর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যাবে দীর্ঘ জীবনের পথে।

এমনকি দেখা গেছে, কেবল একবেলার মেডিটেশন চর্চাও দেহে প্রদাহের জন্যে দায়ী জিনগুলোকে স্তিমিত করে রাখতে সক্ষম, বার্ষিক্য রোধে যা গুরুত্বপূর্ণ। আর মেডিটেশনের প্রথম উপকার হলো স্ট্রেসমুক্তি, যা দেহে ফ্রি-র্যাডিকেলসের (দেহকোষ-ধ্বংসী উপাদান) বিনাশ ঘটায়।

‘তাই মেডিটেশন হওয়া চাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি নিয়মিত অভ্যাস। কারণ বিশ্বজুড়ে পরিচালিত একাধিক গবেষণার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, একজন মানুষ কখন বার্ষিক্যে উপনীত হবে তা শুধুই তার জিনগত বৈশিষ্ট্য নয়, বরং আমাদের জীবনযাপনও এতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।’—বলেন ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, সানফ্রান্সিসকো-র সাইকিয়াট্রিস্ট প্রফেসর এলিসা এপেল।

মনই সকল পরিবর্তনের উৎস

মনোবিজ্ঞানী প্রফেসর এলেন ল্যান্ডার যখন সত্তরের দশকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সবে শিক্ষকতা শুরু করলেন, তখন তিনি বিভিন্ন কৌতূহলোদ্দীপক গবেষণা পরিচালনা করেন। যার একটিতে তিনি আট জনের একটি দল তৈরি করলেন, যাদের সবাই ছিলেন সত্তরোর্ধ্ব পুরুষ এবং তাদের স্বাস্থ্যও ছিল ভালো-মন্দ মিলিয়ে মোটামুটি ধরনের।

পাঁচ দিনব্যাপী গবেষণায় তাদেরকে শোনানো হয় সেসব সঙ্গীত ও রেডিও অনুষ্ঠান, যা তারা তাদের যৌবনে শুনতেন। এ-ছাড়াও তখন তারা সমসাময়িক কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে বরং তারুণ্যে যেসব বিষয় নিয়ে আলাপ করতেন তেমন প্রসঙ্গ তুলে কথাবার্তা বলতেন। এবং এ বয়সের লোকজন যেভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, যেমন : কষ্ট হবে ভেবে হাত থেকে ব্যাগ তুলে নেয়া, কমল গায়ে চড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি তাদের সাথে করা হয় নি। সবকিছু করেছেন তারা নিজেরাই।

পাঁচ দিন পর কিছু অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করা গেল। তাদের প্রত্যেকের

শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা বেড়েছে নাটকীয়ভাবে। বয়সজনিত অনেক ধরনের অক্ষমতার বৃত্ত থেকেও তারা বেরিয়ে আসতে পেরেছেন কারো সাহায্য ছাড়াই।

প্রফেসর ল্যাপ্সার আরেকটি গবেষণা পরিচালনা করেন একদল হোটেল পরিচারিকাদের নিয়ে, যারা নিজেদের ওজন কমাতে চাইছিলেন। তাদেরকে দুটো দলে ভাগ করে একদলকে বলা হয় যে, তারা প্রতিদিন হোটеле তাদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে পরিশ্রমটুকু করছেন তাতে পর্যাপ্ত ক্যালরি-ক্ষয় হচ্ছে এবং ওটাই তাদের ওজন কমানোর জন্যে যথেষ্ট। অন্যদলকে এমন কিছুই বলা হয় নি।

এ গবেষণা শেষেও দেখা গেল চমকপ্রদ ঘটনা। হোটেল পরিচারিকাদের মধ্যে যারা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে নিজেদের ওজন কমছে, তাদের ওজন সত্যিই কমেছে। অন্যদিকে একই ধরনের কাজ ও শারীরিক পরিশ্রম করেও অন্যদের কারোরই কোনো পরিবর্তন ঘটে নি।

গবেষণালব্ধ এসব ফলাফলের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, মন ও শরীর যখন একসাথে এক বিন্দুতে এসে মিলে যায়—এমন ঘটনা কেবল তখনই সম্ভব। তারা বলছেন, এভাবেই সম্ভব হতে পারে দেহকোষের অভ্যন্তরে টেলোমেয়ারের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করা, যা বার্ধক্যগতি শ্লথ করতে অনেকাংশে সক্ষম।

টেলোমেয়ার ৯ দীর্ঘায়ুর প্রাণভোমরা

দেহকোষের অভ্যন্তরে আছে ক্রোমোজোম, যার দুপ্রান্তে থাকে ‘টেলোমেয়ার’ নামক একটি উপাদান। জন্মের পর থেকে প্রতিনিয়ত কোষ বিভাজনের সময় টেলোমেয়ারের দৈর্ঘ্য ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকে। জ্বলন্ত মোমবাতির সলতের মতো এর দৈর্ঘ্য যত কমেতে থাকে, বার্ধক্য তত ত্বরান্বিত হয়।

টেলোমেয়ার নিয়ে প্রথম গবেষণা শুরু হয় ১৯৭৮ সালে। এর সূত্রপাত করেন বিজ্ঞানী এলিজাবেথ ব্ল্যাকবার্ন, সাথে ছিলেন হার্ভার্ডের বিজ্ঞানী জ্যাক জোস্টাক। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে ব্ল্যাকবার্ন ও তার ছাত্র বিজ্ঞানী ক্যারল গ্রাইডার দেহকোষে ‘টেলোমেরেজ’ এনজাইমের অস্তিত্ব খুঁজে পান, যা টেলোমেয়ারের ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ এ

উদ্ভাবনের জন্যে এই তিন জন বিজ্ঞানীই ২০০৯-এ যৌথভাবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

তারা বলেন, টেলোমেয়ারের দৈর্ঘ্যহ্রাস ঘটায় সাথে সাথে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও নিউরোন-ক্ষয়ের ঝুঁকি বাড়ে এবং দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হতে থাকে। তাহলে কীভাবে এটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়? বিজ্ঞানীরা বলছেন, স্ট্রেসমুক্তি এ-ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

চাই স্ট্রেসমুক্ত প্রশান্ত জীবন ও সুস্থ জীবনাচার

২০১৪ সালে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, সানফ্রান্সিসকো-তে ২৩৯ জন নারীর ওপর পরিচালিত বছরব্যাপী একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যারা মেডিটেশনের মাধ্যমে স্ট্রেসমুক্ত জীবনযাপন, নিয়মিত ব্যায়াম, বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত ঘুম ইত্যাদি সুস্থ জীবনাচার অনুসরণ করেছেন তাদের টেলোমেয়ারের দৈর্ঘ্যহ্রাস ততটা ঘটে নি, যতটা ঘটেছে স্ট্রেস-আক্রান্ত ও পরিশ্রমহীন জীবনযাপনকারীদের ক্ষেত্রে।

এ ফলাফলের প্রেক্ষিতে প্রফেসর এলিসা এপেল ও তার সঙ্গীরা জানিয়েছেন, স্ট্রেস ও ভুল জীবনধারার কারণে জন্মের পর তো বটেই, জন্মের আগে মাতৃগর্ভেই শিশুর টেলোমেয়ার-দৈর্ঘ্য দ্রুত হ্রাস পেতে পারে, মা যদি স্ট্রেস-আক্রান্ত হন। তারা বলেন, জীবনে নানা কারণে ঘুরেফিরে স্ট্রেস আসতেই পারে; কিন্তু কথা হচ্ছে, আপনি কি হাল ছেড়ে দিয়ে পরাজয় বরণ করে বসবেন, নাকি মেডিটেশন এবং সুস্থ জীবনাচারের মধ্য দিয়ে একে সচেতনভাবে মোকাবেলা করবেন?

২০১৩ সালে মেডিসনের ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন-এ পরিচালিত একটি গবেষণার ভিত্তিতে নিউরোসায়েন্টিস্ট রিচার্ড ডেভিডসন বলেন, স্ট্রেসমুক্তির জন্যে অন্যান্য যে-কোনো পদ্ধতির চেয়ে মেডিটেশন নিশ্চিতভাবেই অধিকতর কার্যকরী।

মেডিটেশন-চর্চাকারীদের মস্তিষ্কের এমআরআই করে তিনি রায় দিয়েছেন, যারা নিয়মিত মেডিটেশন করেন তাদের মস্তিষ্কের থ্রে-ম্যাটারের বয়সজনিত ক্ষয় অন্যান্যদের চেয়ে তুলনামূলক কম। এমনকি হার্টের বাইপাস অপারেশনের পরও যারা ক্রমাগত চেষ্টায় মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনাচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন, পরবর্তী জীবনে যে-কোনো

হৃৎ-জটিলতায় আক্রান্ত হওয়া কিংবা পুনরায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আশঙ্কা তাদের কমে যায় অনেকখানি।

জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার পথিকৃৎ ডা. ডীন অরনিশ এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী যুক্তরাষ্ট্রের বর্ষীয়ান চিকিৎসাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীরা সকলেই একবাক্যে রায় দিচ্ছেন যে, এ এক যুগান্তকারী উদ্ভাবন।

আর এ ধারাবাহিকতায় বিশ্বের প্রথমসারির স্বাস্থ্য-গবেষক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, চিকিৎসক হিসেবে আমাদের উচিত রোগীদের সামনে এ বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা, যাতে শরীর ও মনের পারস্পরিক সম্পর্কটি তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং বিষয়টি তারা ভালোভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারেন। সেইসাথে রোগীদের প্রতি আমাদের আশ্বাসবাণীটা হচ্ছে, সময়ের সাথে সাথে আপনার বয়স বাড়বে, একথা সত্য; কিন্তু সচেতন প্রচেষ্টায় সুস্থ জীবনচর্চার মাধ্যমে আপনি যাপন করতে পারেন এক কর্মানন্দময় সুখী জীবন।

তথ্যসূত্র : টাইম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ও ২ মার্চ ২০১৫

প্রো-একটিভ হোন।

প্রো-একটিভ মানুষের প্রতি

অন্যেরা আকৃষ্ট হয়।



স্ট্রেসে ভুগছেন দিনের পর দিন? নানামুখী চাপে প্রতিদিন ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছেন একটু একটু করে? নাকি বিষণ্ণতার কালো ছোবলে আক্রান্ত? কিংবা রোগে শোকে সংকটে বেদনায় হয়ে পড়েছেন উদ্যমহীন?

ভয় নেই। এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন আপনি নিজেই। চাই শুধু আপনার ইচ্ছা ও সচেতন প্রচেষ্টা। জ্ঞানীরা বলেন, দম হচ্ছে জীবনের মূল ছন্দ। এই দম বা শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রতি মনোযোগী হোন। জীবনের ছন্দ সত্যিই ফিরে আসবে।

বিশ্বজুড়ে আধুনিক ধারার চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, স্ট্রেসমুক্ত হওয়ার সহজ ও কার্যকর পন্থাটি রয়েছে ঠিক আপনার নাকের গোড়ায়! সুস্থির হয়ে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে এবং নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ধীরলয়ে দম নেয়া আর ছাড়ার অভ্যাস করুন (কোয়ান্টাম পরিভাষায় ‘নাসায়ন’)। পাশ্চাত্যে এর পোশাকি নাম ‘ব্রিদিং এক্সারসাইজ’ হলেও, এটি মূলত প্রাচ্যের হাজার বছর আগের সাধকদের উদ্ভাবিত ‘প্রাণায়াম’।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাণায়াম চর্চায় ধীরলয়ে নেয়া গভীর দম আপনাকে মনোদৈহিকভাবে সুস্থ রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ ও অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিনের প্রতিষ্ঠাতা ডা. এড্রু ওয়েল বলেন, ‘অনেক গবেষক কল্পনাই করতে পারছেন না যে, এই সাধারণ অভ্যাসটি মানুষের শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমকে এতটা প্রভাবিত করতে পারে!’

স্বাস্থ্য-গবেষকরা বলছেন, মনোযোগায়ন ও যোগ সাধনার মূল বিষয়টি হলো দমচর্চা। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, হৃৎস্পন্দন থাকে স্বাভাবিক। আর্টারিকে করে তোলে অধিকতর নমনীয়, সেইসাথে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমকে রাখে সক্রিয়। উল্লেখ্য, স্ট্রেসের প্রতিক্রিয়ায় দেহাভ্যন্তরে যে ক্ষতিকর উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাকে প্রশমিত করে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। এসব তথ্য-উপাত্তের আলোকে ডা. ওয়েল এবং তার সহযোগীরা মনে করছেন যে, বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এই প্রাণায়াম। ওয়েল বলেন, আমাদের ইনভলান্টারি নার্ভাস সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণের এটাই হলো একমাত্র উপায়।

ক্রনিক হার্ট ফেইল্যুরের রোগীদের ক্ষেত্রে দমচর্চার প্রভাব নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছেন ইতালির প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. লুসিয়ানো বার্নার্ডি। তাতে দেখা গেছে, দমচর্চার ফলে এসব রোগীদের দৈনিক সক্ষমতা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, মস্তিষ্কের যে অংশটি বিষণ্ণতা রোধে ভূমিকা রাখে তাকেও সক্রিয় করে তোলে প্রাণায়াম।

এ-ছাড়াও উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ক্ষেত্রে দৈনিক ১০ মিনিট প্রাণায়াম চর্চা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রক্তচাপ কমায়। অনিদ্রা রোগীদের বেলায় ঘুমোতে যাওয়ার আগে ২০ মিনিট প্রাণায়াম সুনিদ্রা আনে। দিনে কয়েকবার প্রাণায়াম অনুশীলন করেন যারা তাদের শরীরে অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা ৩৭% পর্যন্ত বেড়ে যায়। সজীবতা বাড়ে স্বাভাবিকভাবেই।

২০১৫ সালে পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, প্রতি সপ্তাহে দুবার করে যারা টানা আট সপ্তাহ যোগব্যায়াম এবং প্রাণায়াম করেছেন, তাদের উদ্বেগজনিত অসুস্থতার হার কমে গেছে অনেকটাই।

এসব গবেষণা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এ-যুগের স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হচ্ছে—নিয়মিত ধীরলয়ে দমচর্চা (নাসায়ন) করুন। শারীরিক মানসিক সবদিক থেকেই আপনি ভালো থাকবেন।

উল্লেখ্য, প্রাণায়ামের সহজ নিয়ম জানতে দেখুন নাহার আল বোখারী প্রণীত রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা বইটি।

তথ্যসূত্র : টাইম, ১৬ নভেম্বর ২০১৫



মস্তিষ্কের
ক্ষমতা
ও মনের শক্তিকে
সুতীক্ষ্ণ করে
মেডিটেশন



মাইন্ড অব দ্য মেডিটেটর শিরোনামে একটি প্রাচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে খ্যাতনামা বিজ্ঞান-সাময়িকী সায়েন্টিফিক আমেরিকান। মেডিটেশনের বিভিন্ন দিক নিয়ে নিউরোসায়েন্টিস্টদের সর্বশেষ গবেষণা ও তথ্য-উপাত্তের আলোকে রচিত এ নিবন্ধটি যৌথভাবে লিখেছেন ম্যাথু রিকার্ড, অ্যান্টনি লাট্জ ও রিচার্ড জে ডেভিডসন।

একসময় সেলুলার বায়োলজিস্ট হিসেবে কাজ করলেও বর্তমানে ম্যাথু রিকার্ড একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। বছর চল্লিশেক আগে তিনি ফ্রান্স ছেড়ে হিমালয়ে পাড়ি জমান এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন।

ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ এন্ড মেডিকেল রিসার্চ এবং যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-বিজ্ঞানী অ্যান্টনি লাট্জ। তিনি নিউরো-বায়োলজি অব মেডিটেশন বিষয়ক দীর্ঘ গবেষণায় নেতৃত্ব দেন।

এ-ছাড়াও উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েজমেন ল্যাবরেটরি ফর ব্রেন ইমেজিং এন্ড বিহেভিয়ার এবং সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিং হেলদি মাইন্ডস-এর পরিচালক রিচার্ড জে ডেভিডসন মেডিটেশন ও বিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণায় একজন পুরোধা বিজ্ঞানী।

আলোচ্য নিবন্ধটির ভূমিকায় বলা হয়েছে, ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি-তে অনুষ্ঠিত হয় সোসাইটি ফর নিউরোসায়েন্সের বার্ষিক সম্মেলন। আর তাতে আলোচনার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয় তিব্বতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক নেতা ১৪ তম দালাই লামা ও সাধক তেনজিন গ্যাৎসোকে। কিন্তু সোসাইটির অন্তত কয়েকশ সদস্য এতে আপত্তি জানান। তাদের বক্তব্য ছিল, এমন একটি বিজ্ঞান সম্মেলনে ধর্মীয় নেতার অবস্থান বা তার কথার গুরুত্ব কতখানি? একপর্যায়ে তারা এ আমন্ত্রণ বাতিলের দাবি পর্যন্ত তোলেন।

যা-হোক, পরে দালাই লামা অবশ্য আলোচনা করেন এবং বিরোধী মতের বিজ্ঞানীদের ধারণায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে যখন তিনি প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও এর চিরায়ত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, বিশেষত মেডিটেশনকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন করেন।

কেন মেডিটেশন

পৃথিবীর সব প্রধান ধর্মেই গুরুত্বের সাথে মেডিটেশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মেডিটেশন বা ধ্যান প্রকৃত অর্থে এমন একটি নিমগ্ন চর্চার বিষয়, যা মানুষের মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। মানুষকে ধীর স্থির এবং তার মনকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন করে তোলে। আবেগীয় ভারসাম্য বজায় রাখে। মনোযোগকে করে লক্ষ্যভেদী। হৃদয়ে সৃষ্টি করে গভীর কল্যাণচেতনা, ভালবাসা, সমর্মিতা। সবমিলিয়ে আমরা বলতে পারি, সবদিক থেকে ভালো থাকার জন্যে মেডিটেশন একটি সহজ উপায়।

আর মেডিটেশন এখন নিছক ধর্মীয় কোনো বিষয় নয়। সারা পৃথিবীতেই আজ এটি জীবনচর্চার একটি বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় অনুশঙ্গ, যা নিয়মিত অনুশীলনে মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও মনের শক্তি হয়ে ওঠে সুতীক্ষ্ণ ও সুসংহত। তাই এর চর্চা আজ বিশ্বব্যাপী সর্বত্র-এমনকি স্কুল থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত।

গবেষণায় দেখা গেছে, মেডিটেশন মানুষকে সচেতন করে তোলে সার্বিকভাবে এবং বদলাতে সাহায্য করে মনোদৈহিক অস্তিত্বের একেবারে ভেতর থেকে। আমাদের দেহকোষ ও শারীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ড এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে এটি নিরাময়ে রাখে বিশেষ ভূমিকা। উচ্চতর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, দীর্ঘদিনের ব্যথা-বেদনা থেকে গুরু করে বিষণ্ণতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে এর ভূমিকা রয়েছে।

মস্তিষ্কের গঠন ও কর্মকাঠামোতে ঘটে ইতিবাচক পরিবর্তন

মস্তিষ্কের গঠন ও কর্মকাঠামোতে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করে মেডিটেশন। যখন আমরা জাগলিং বা এ ধরনের কোনো কৌশল আয়ত্ত করি কিংবা কোনো বাদ্যযন্ত্র চালনায় দক্ষতা অর্জন করি, তখন আমাদের নিউরোপ্লাস্টিসিটি বাড়ে অর্থাৎ মস্তিষ্কের নিউরোনগুলোর মধ্যে বহুগুণে বাড়ে আন্তঃপারস্পরিক যোগাযোগ।

আর মস্তিষ্কের যে অংশ এটি (বিভিন্ন কৌশল ও বাদ্যযন্ত্র চালনা) নিয়ন্ত্রণ করে, সে অংশের পুরাত্ব বৃদ্ধি পায়। একাধিক গবেষণায় নিশ্চিত হয়ে এ শতকের শুরু থেকেই নিউরোসায়েন্টিস্টরা বলছেন, নিয়মিত মেডিটেশন চর্চার ফলে একই ঘটনা ঘটে।

শুধু তা-ই নয়, এর পাশাপাশি মেডিটেশন চর্চাকারী শরীর-মনে উপভোগ করেন ভালো থাকার এক অভূতপূর্ব অনুরণন, যা মনকে প্রশান্ত করে। সব ধরনের স্ট্রেস থেকে মুক্ত করে। সেইসাথে সারা শরীরে ছড়িয়ে দেয় সুস্বাস্থ্যের এক দারুণ অনুভূতি, যা তার নিরাময় ও সার্বিক সুস্থতাকে নিশ্চিত করে।

মানসিক প্রশান্তি আর ব্যথামুক্তির অনুভূতি হয় মেডিটেশনে

বিক্ষিপ্ত আর ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো মনকে প্রশান্ত করে মেডিটেশন। সাধকরা কথাটা বলছেন হাজার বছর ধরেই। বিজ্ঞানীরা বুঝতে শুরু করেছেন সম্প্রতি, বড়জোর কয়েক দশক।

প্রতিদিন নানা কারণে-চারপাশে কী হচ্ছে, ঘটছে, চলছে কিংবা কর্মক্ষেত্রে অসহযোগী সহকর্মী বা বাড়িতে দুরন্ত সন্তানের চিন্তা-এমন অসংখ্য নানামুখী ভাবনায় আচ্ছন্ন থাকে আমাদের মন। ব্যাহত হয় আমাদের মনোযোগ আর কাজ। মেডিটেশনকেই এর কার্যকর সমাধান হিসেবে রায় দিচ্ছেন আধুনিক মনোবিদ ও বিজ্ঞানীরা।

২৫৬টি ইলেক্ট্রোড সংযুক্ত করে
ম্যাথু রিকার্ডের মস্তিষ্কে
মেডিটেশনের প্রভাব
অনুসন্ধান করা হচ্ছে



মেডিটেশনে ব্যথামুক্তির অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এমনটাই জানাচ্ছেন গবেষকরা। তারা বলছেন, ব্যথা যেমনই হোক, অন্যান্যদের চেয়ে মেডিটেশন চর্চাকারীরা তা অনুভব করেন তুলনামূলক কম। এ-ছাড়াও যে-কোনো ধরনের সংক্রমণের ঝুঁকিও তাদের ক্ষেত্রে কম। সেইসাথে তাদের শরীরে স্ট্রেস হরমোনের প্রবাহ হ্রাস পায় বলে স্ট্রেসজনিত রোগ থেকে তারা তুলনামূলক মুক্ত থাকেন। তাদের ঘুম ভালো হয়।

এসব কারণে বিষণ্ণতার হার বেশ কমে যায় নিয়মিত মেডিটেশনে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট জন টিসডেইল ও টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জিন্দেল সেগাল ২০০০ সালে পরিচালিত একটি গবেষণায় প্রমাণ করেন যে, বিষণ্ণতার রোগীদের ক্ষেত্রে ছয় মাস নিয়মিত মেডিটেশন বিষণ্ণতা উপশমে সহায়ক।

মমতা ও সমমর্মিতাপূর্ণ সুখী জীবনের পথে

নিয়মিত মেডিটেশন করেন যারা, তাদের মনোজগত ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটে গভীর পরিবর্তন। হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে মমতা ও সমমর্মিতায়, তা কেবল নিজের পরিবারের সদস্য ও আপনজনদের জন্যে নয়, এমনকি হতে পারে খোদ শত্রুর জন্যেও। অন্যের প্রয়োজন ও চাহিদা তাদের কাছে গুরুত্ব পায় অনেক বেশি।

আর এ অনুভূতিটা হয় নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্ত। দৃষ্টিভঙ্গির জগতে ঘটে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি জীবনকে করে তোলে প্রশান্ত, স্থির। ইতিবাচক আবেগের প্রাবল্য বৃদ্ধি পায়। পরিবর্তনের সূচনা ঘটে মস্তিষ্কের গঠন ও কর্মপন্থায়। ইলেক্ট্রো-এনসেফালোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে এমন অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা আর বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গবেষকরা তাই বলছেন, নিয়মিত মেডিটেশন করুন। শারীরিক-মানসিক সুস্বাস্থ্য অর্জনসহ সবদিকেই আপনি ভালো থাকবেন। এগিয়ে যাবেন কর্মপ্রাণ সুখী জীবনের পথে।

তথ্যসূত্র : সায়েন্টিফিক আমেরিকান, নভেম্বর ২০১৪

মেডিটেশন
ও সুস্থ জীবনাচার
বিষণ্ণতা
প্রতিরোধ ও
নিরাময় করে



‘আপনার প্রতিবেশী যখন চাকরি হারায় সেটা মন্দা (Recession), আপনি হারালে যা ঘটে সেটাই বিষণ্ণতা (Depression)।’ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান কথাটা বলেছিলেন কিছুটা কৌতুকচ্ছলেই। কিন্তু বিষণ্ণতার কবলে পড়েন যিনি, তিনিই কেবল বোঝেন এর নিত্যযন্ত্রণা ও মর্মবেদনা। অগণিত ভোগ্যপণ্য আর নিত্যনতুন প্রযুক্তির ভিড়ে মানুষ যখন ক্রমাগত হারিয়ে ফেলছে নিজেকেই, তখন বিশ্বজুড়ে বিষণ্ণতার প্রকোপ বাড়ছে, এ আর অস্বাভাবিক কী!

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে ৩৫ কোটিরও বেশি মানুষ নানা মাত্রায় বিষণ্ণতার শিকার। এ এখন আর নির্দিষ্ট কোনো বয়সের সীমায় আটকে নেই।’ ৬০-এর দশকে বিষণ্ণতা-আক্রান্ত হওয়ার গড় বয়স ছিল ২৯ বছর, এখন তা নেমে এসেছে ১৪-তে!

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল কলেজ হেলথ সার্ভের অধীনে সে-দেশের কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের ওপর বিষণ্ণতার প্রকোপ নিয়ে একটি অনুসন্ধান চালানো হয়। কয়েক বছর ধরে পরিচালিত ব্যাপক আকারের এ গবেষণা থেকে বেরিয়ে আসে রীতিমতো ভয়াবহ তথ্য। যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ-ছাত্রদের শতকরা ৪৫ ভাগ মোটামুটি বিষণ্ণতা-আক্রান্ত। আর শতকরা ৮০ জনই রয়েছে বিষণ্ণতা-ঝুঁকিতে।

বিষণ্ণতার কারণ, প্রতিকার ও এটি প্রতিরোধের কার্যকর উপায় নিয়ে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিষণ্ণতা প্রতিরোধ ও নিরাময়ের কয়েকটি উপায় বাতলে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

চাই গভীর সুখনিদ্রা

অনিদ্রা বা গভীর ঘুমের অভাব বিষণ্ণতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ঘুম আর বিষণ্ণতার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কটি বিপরীতমুখী। বিষণ্ণতা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়, আবার অগভীর ঘুম ঠেলে দেয় বিষণ্ণতার দিকে। অর্থাৎ ঘুম ভালো না হলে বিষণ্ণতার মাত্রা বাড়ে, আর এর মাত্রা যত বাড়ে ঘুম ক্ষতিগ্রস্ত হয় ততটাই। এ এক দুষ্টচক্র, কিছুদিন টানা চলতে থাকলে যা পরিস্থিতিকে নিয়ে যেতে পারে আরো খারাপের দিকে।

তাই প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুমান। আপনার ঘুমের সঠিক পরিমাণ নির্ভর করে আপনার জীবনযাত্রা ও বয়সের ওপর। গবেষকরা বলেন, স্বাভাবিকভাবে দিনে প্রয়োজন গড়ে ছয় ঘণ্টা ঘুম।

নিয়মিত ব্যায়াম ৯

ওষুধের চেয়েও কার্যকর

ব্যায়ামের সাথে মনোদৈহিক সুস্থতার সুসম্পর্ক নিয়ে গবেষণা হয়েছে বিস্তর। বলা হচ্ছে, এ-সংক্রান্ত গবেষণায় বিপ্লব ঘটে গেছে। আর তার ফলে মনের সুস্থতার জন্যে শারীরিক পরিশ্রমের গুরুত্ব নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন মনোবিদরা।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক মেডিকেল স্কুলের গবেষক মিশেল ব্যাবিয়াক ও তার সহযোগীরা এ-সম্পর্কিত একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। এ গবেষণায় তীব্র বিষণ্ণতাক্রান্ত ১৫৬ জন রোগীকে নির্বাচন করা হয়-যারা বহুদিন ধরে অনিদ্রা ও ক্ষুধামন্দায় ভুগছিলেন, এমনকি আত্মহত্যার চিন্তাও পেয়ে বসেছিল তাদের।

১৫৬ জনকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করেন গবেষকরা। প্রথম গ্রুপকে সপ্তাহে তিন দিন আধঘণ্টা করে হালকা ব্যায়ামের পরামর্শ দেয়া হয়। দ্বিতীয় গ্রুপকে দেয়া হয় বিষণ্ণতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রচলিত ওষুধ। তৃতীয় গ্রুপকে ব্যায়াম এবং ওষুধ দুয়েরই পরামর্শ দেয়া হয়।

চার মাস পর পাওয়া গেল অভূতপূর্ব ফলাফল। তিনটি গ্রুপের মধ্যে শতকরা ৬০ জনেরই অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। প্রমাণিত হলো, বিষণ্ণতা প্রতিকারে ব্যায়াম ওষুধের মতোই কার্যকর।

না, এখানেই শেষ নয়। সুস্থ হওয়া রোগীদের ছয় মাস পর ফলো-আপ করলেন ব্যাবিয়াক। রিপোর্টে দেখা গেল, যারা ওষুধ সেবন করেছিলেন তাদের শতকরা ৩৮ জন এবং যারা ব্যায়াম ও ওষুধ দুয়েরই সাহায্য নিয়েছেন তাদের শতকরা ৩১ জন পুনরায় বিষণ্ণতাক্রান্ত হয়েছেন। আর যারা শুধু ব্যায়াম করেছেন তাদের পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার হার মাত্র শতকরা ৯ ভাগ।

উপসংহারে বলা হয়, বিষণ্ণতা রোধে ওষুধের চেয়েও ব্যায়াম দীর্ঘমেয়াদে অধিকতর কার্যকরী। গবেষকরা বলছেন, হাজারো গবেষণায় এটি এখন প্রমাণিত যে, আমাদের মনোদৈহিক সুস্থতার জন্যে ব্যায়াম দারুণভাবে উপকারী এবং বিষণ্ণতা রোধে এটি সর্বোত্তম পন্থা।

মেডিটেশন আপনাকে সুখী করে

আমাদের সার্বিক সুস্থতার জন্যে মেডিটেশন এক পরীক্ষিত পদ্ধতি। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর বিজ্ঞানীরা রায় দিচ্ছেন, দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা থেকে রেহাই পেতে মেডিটেশন অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সহযোগে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা বুঝতে সমর্থ হয়েছেন নিয়মিত মেডিটেশন চর্চাকারীদের মস্তিষ্কের গঠন ও গতিপ্রকৃতি।

মানবমস্তিষ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স। এর বাম দিকটি যাদের বেশি সক্রিয় তারা সুখী। ডান দিকটি বেশি সক্রিয় যাদের তারা কিছুটা মনমরা, বিষণ্ণ। ইইজি ও এমআরআই-এর সাহায্যে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চাকারীদের মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাদের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সের বাম দিকটি বেশি সক্রিয়। তারা ইতিবাচকতায় উদ্দীপ্ত এবং নেতিবাচক আবেগের মুখে ততটাই দৃঢ়, অটল।

গবেষকরা জানাচ্ছেন, মেডিটেশনের সুফল পেতে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতো এটি সারাদিন চর্চা করতে হবে তা নয়, দিনে ১৫ মিনিট ধ্যানচর্চাও এনে দিতে পারে কাজিফত পরিবর্তন।

রক্তের শর্করা-মান রাখুন নিয়ন্ত্রণে

বিষণ্ণতা রোধে রক্তের শর্করা-মান নিয়ন্ত্রণ একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। রক্তের শর্করা-মান কমে গেলেও মনের আকাশে জমতে পারে বিষণ্ণতার কালো মেঘ। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শরীর আর মন পরস্পর গভীরভাবে সংযুক্ত। একটি বিকল হলে পিছু নেয় অন্যটিও।

সাধারণত রক্তে শর্করা-ধস (Low Blood Sugar) নেমে আসে শর্করা-তুঙ্গতার (High Blood Sugar) পথ ধরেই। তাই রক্তে শর্করার পরিমাণ অতিরিক্ত বাড়তে না দেয়াটাই হবে শর্করা-ধস ঠেকানোর মোক্ষম উপায়। এজন্যে একবারেই বেশি নয়, বরং একই পরিমাণ শর্করা সারাদিনে খেতে হবে ভাগ ভাগ করে। সাথে প্রোটিন ও ফ্যাটের পাশাপাশি চাই আঁশজাতীয় খাবার (প্রতি এক হাজার ক্যালরিতে ন্যূনতম ১২ গ্রাম)।

খুঁজে নিন আনন্দের কাজ

আপনার পছন্দের কিংবা ভালোলাগার কাজ কোনটি, সবচেয়ে ভালো জানেন তা আপনিই। সে কাজে ডুবে গেলে দুশ্চিন্তা ক্লেদ কষ্টের কোনো অনুভূতিই

স্পর্শ করে না আপনাকে। আত্মমগ্ন হয়ে পড়েন আপনি। এমন কাজে সময় দিন। আনন্দময় সময় কাটান। আপনি ভালো থাকবেন। বিষণ্ণতার স্মৃতি থাকবে অনেক দূরে।

তাই আপনার পছন্দের কাজটি খুঁজে বের করা জরুরি, যে কাজের আনন্দ কখনো ফুরিয়ে যায় না। হতে পারে তা ছবি আঁকা, লেখা, খেলাধুলা কিংবা আত্ম উন্নয়নমূলক কাজে সময় ব্যয় এবং মানুষের জন্যে কাজ করা।

একা নয়, থাকুন একসাথে

মহীয়সী মাদার তেরেসার কথা হলো, ‘একাকিত্ব আর মমতাহীনতার অনুভূতিই সবচেয়ে ভয়াবহ দারিদ্র্য।’ বলা যায়, সেই দারিদ্র্যই ভুগছে আধুনিক মানুষ। এত পণ্যের অবিরাম প্রাচুর্য, কিন্তু বাড়ছে স্বজনহীন মমতাহীন নিঃসঙ্গ দিনযাপনের ঘটনা।

আজকের পৃথিবীতে বিষণ্ণতার হার বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ এটিই, বলছেন গবেষকরা। সামাজিক সম্পর্কগুলোতে তো বটেই, চিড় ধরেছে পারিবারিক সম্পর্কের উষ্ণতায়ও। অতিরিক্ত চাপ, টিভি আর হরেক রকম প্রযুক্তি ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে আমাদের প্রিয় সম্পর্কগুলোকে।

অথচ বন্ধু স্বজন প্রতিবেশীদের সাথে হাসি-আনন্দে সময় কাটানোকে স্বাস্থ্যকর সামাজিক পথ্য (Healthy Social Medicine) হিসেবে অভিহিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেন, নিঃসঙ্গ মানুষের ওপরই বিষণ্ণতার আক্রমণ বেশি। আবার বিষণ্ণতা পেয়ে বসে যাদের, তারাও একাকীই থাকতে চান। এতে বিষণ্ণতা বাড়ে বৈ সারে না।

তাই পরিবারের সাথে সময় কাটান, বন্ধু আত্মীয় পরিজনদের সুখ-দুঃখের সাথী হোন। মমতা দিন। একা নয়, থাকুন একসাথে। পরিবারের সাথে। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষের সাথে। সবার সাথে। সবার পাশে। সবাইকে নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান। পরার্থে কিছু করুন। বিষণ্ণতা আপনার ধারেকাছে ঘেঁষার সুযোগই পাবে না!

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে জনপ্রিয় সেই আফ্রিকান প্রবাদটির কথা— যদি তুমি দ্রুত যেতে চাও তবে একা যাও, আর যদি বহুদূর এগিয়ে যেতে চাও তাহলে সবাইকে সাথে নিয়ে যাও।

তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৩

নিয়মিত
মৌনতা চর্চায়
আপনি হবেন
প্রশান্ত
উদ্যমী
সৃজনশীল



ত্রয়োদশ শতকের পারস্য-কবি ও মহান সাধক মওলানা জালালউদ্দীন রুমি। অনন্য স্রষ্টাপ্রেম ও দীর্ঘ সাধনায় তিনি উপনীত হয়েছিলেন জীবনের গভীরতর কিছু উপলব্ধিতে। তার এমনই একটি উপলব্ধির মর্মার্থ ছিল— ‘নীরবতা হলো স্রষ্টার ভাষা, বাদবাকি সব তাঁর কথার অতি দুর্বল ভাষান্তর।’ নীরবতা অর্থাৎ মৌনতার মধ্য দিয়ে প্রিয়তম পরমসত্তাকে উপলব্ধি করেছিলেন সাতশ বছর আগের এই সুফি কবি।

এ-কালের বিজ্ঞানীরাও বলছেন, নিয়মিত মৌনতার চর্চা করা উচিত আমাদের সবারই। তাতে মস্তিষ্ক যেমন হয়ে উঠবে শাণিত ও সৃজনশীল, তেমনি শরীর-মন থাকবে স্ট্রেস ও টক্সিনমুক্ত। মৌনতার সাথে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি আর মনোদৈহিক সুস্থতার সম্পর্কটা চলুন আরো খতিয়ে দেখা যাক!

কোলাহল-মহামারীতে বিপর্যস্ত পৃথিবী ॥

ঘটছে মস্তিষ্ক ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি

অবিশ্বাস্য শোনাতেও সত্যি, এই একশ বছর আগেও পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল টেনেটুনে ১৭০ কোটি; আজ তা ছাড়িয়ে গেছে ৬০০ কোটির ঘর। একদিকে মানুষের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বিজ্ঞানের অগ্রগতি-উদ্ভাবনে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অভূতপূর্ব সব প্রযুক্তিপণ্য, যা আমাদের জীবনযাত্রাকে অনেক সহজ করে তুলেছে সত্যি, কিন্তু বাড়িয়েছে ফুরসতহীন কর্মব্যস্ততা, বেড়েছে যোগাযোগ, স্বভাবতই বেড়েছে কোলাহল। ঘরে বাইরে রাস্তায় অফিসে হাটে মাঠে সর্বত্রই আজ শব্দের একচ্ছত্র দাপট।

সমাজতাত্ত্বিকরা বলছেন, আগে পরিবারের সবার জন্যে বাড়িতে ছিল একটি ল্যান্ডফোন, এখন সেখানে প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা মোবাইল ফোন। ফলে কথাও বেড়েছে প্রচুর, দরকার থাকুক বা না থাকুক। নীরবতার সুযোগ কমেছে ক্রমশ। এ পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞরা অভিহিত করছেন কোলাহল-মহামারী নামে।

২০১১ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পৃথিবীজুড়ে ক্রমবর্ধমান কোলাহল ও শব্দদূষণকে আখ্যা দিয়েছে ভয়াবহ ‘আধুনিক প্লেগ’ হিসেবে।

চারপাশের বহুমুখী শব্দের আধাসনে নীরবে ঘটে চলেছে আমাদের স্বাস্থ্যহানি। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড। হাজারো শব্দমালার ভারে মস্তিষ্ক হয়ে উঠছে ভারাক্রান্ত। এর ফলে মস্তিষ্কে সৃষ্ট রাসায়নিক গোলযোগে ব্যাঘাত ঘটে আমাদের সমন্বয়-ক্ষমতা মনোযোগ ও কর্মদক্ষতায়, যার অপপ্রভাব পড়ে দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি সংরক্ষণে। তাই এ থেকে উত্তরণের উপায় নিয়েও ভাবতে শুরু করেছেন স্বাস্থ্য-গবেষকরা।

মৌনতা আবেগকে সংহত করে বাড়ায় মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা ও সৃজনশীলতা

মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়া সুসম্পাদনের জন্যেই মৌনতা গুরুত্বপূর্ণ। গবেষকরা বলছেন, মস্তিষ্কের সুস্থতার জন্যে মৌনতার প্রয়োজনীয়তা আমরা যতটা ভাবতে পারি তার চেয়েও বেশি। ২০১৩ সালে খ্যাতনামা নিউরোসায়েন্স জার্নাল *ব্রেন*, *স্ট্রোকচার এন্ড ফাংশান*-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতিদিন দু-ঘণ্টা করে মৌনতা বা নীরবতা পালন মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাসে নতুন কোষ জন্ম দিতে সক্ষম। উল্লেখ্য, মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস অংশটি আমাদের স্মৃতিশক্তি, আবেগ এবং নতুন কিছু শেখার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে।

মৌনতার সময় মস্তিষ্ক বিশ্রাম নেয়, এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং মস্তিষ্ক তখন নীরবে করে চলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ। *ফ্রন্টিয়ার্স ইন হিউম্যান নিউরোসায়েন্স* জার্নালে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জোসেফ মোরান ও তার সহযোগীরা জানান, আমরা যখন নীরব থাকি তখন নানা সময়ে বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তগুলো যাচাই-বাছাই করে তা সমন্বয় ও আত্মস্থ করার কাজে মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকে। ফলে এসব এলোমেলো তথ্যমালাই একসময় হয়ে ওঠে সচেতনভাবে ব্যবহারের উপযুক্ত।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, আপনি যখন কোলাহল বা হরেক রকম কাজের হুড়োহুড়ি থেকে কিছুটা নীরব অবসরে থাকেন, আপনার মস্তিষ্ক তখন তথ্যমালা পুনর্বিন্যাস ও প্রক্রিয়াজাত করার সুযোগ পায়। কারণ এটি তখন খুঁজে পায় পূর্ণাঙ্গ কর্মস্বাধীনতা।

ফলে মেলে নিত্যনতুন সৃজনশীল আইডিয়া। এটা কল্পনা করেই বুঝি আমেরিকান রেনেসাঁ যুগের লেখক-কবি হারম্যান মেলভিল বলেছিলেন,

জীবনের গভীর ও আবেগীয় সব অনুষ্ণগুলো পরিণত ও সুবিন্যস্ত হয়ে ওঠে মৌনতার মধ্য দিয়ে।

চাপ ও টেনশন দূর করে আত্মিক প্রশান্তি দেয় মৌনতা

দৈনন্দিন কোলাহল ও শব্দদূষণ মস্তিষ্কের পাশাপাশি আমাদের শরীরকেও প্রভাবিত করে ভীষণভাবে। স্ট্রেস হরমোনের আধিক্য বাড়ে শরীরে। অন্যদিকে মৌনতা দেহ-মনের টেনশন দূর করে। অযাচিত চাপ কমায়ে।

টেনশনমুক্তি ও মনের চাপ কমাতে আমরা অনেক সময় মিউজিক শুনে থাকি; গবেষকদের মতে, দু-মিনিটের মৌনতা মিউজিক শোনার চেয়েও বেশি প্রশান্ত করে মনকে। এ-ছাড়াও দেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ও মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন বাড়াতেও মৌনতা রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

মৌনতা চেতনা ও বুদ্ধিমত্তাকে শাণিত করে। ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে স্পষ্ট হয় দক্ষতার ছাপ। মনোযোগ দিয়ে কিছু শেখা, মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করা, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও জটিল সমস্যা সমাধানের মতো ব্যাপারগুলোতে নিয়মিত মৌনতা চর্চার পরামর্শ দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের মতে, পারিপার্শ্বিক কোলাহলমুখরতায় মস্তিষ্ক যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তা ভালোভাবেই পুষিয়ে দেয় মৌনতা।

মৌনতা ধ্বস্তরি। ডিজাইন প্রতিষ্ঠান মিলানো-র সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ওলে ক্যাম্পবেলের কথায় স্পষ্ট হয়েছে এর রহস্য। তিনি বলেন, তাদের প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে সচেতন। কর্মীদের মনোযোগ ও সৃজনশীলতা বাড়িয়ে তোলার জন্যে তারা তাদের কর্মীদের প্রতিদিন কিছুটা সময় নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটানোর সুযোগ করে দেন। এভাবে টানা চার বছর চলার পর দেখা গেছে, তাদের উৎপাদন ২৩ শতাংশ বেড়ে গেছে!

নিয়মিত মৌনতা চর্চা করুন আপনি থাকবেন প্রশান্ত ও কর্মদ্যোমী

মৌনতার এমন সব সঞ্জীবনী ক্ষমতা আর মনোদৈহিক প্রাপ্তিযোগ বিবেচনা করে গবেষকরা এখন বলছেন, নিয়মিত মৌনতা চর্চা করুন। দিনের শুরুতে অন্তত ১০ মিনিটের হিরণ্য মৌনতা আপনাকে সারাদিনের জন্যে করে তুলবে প্রশান্ত, লক্ষ্য-সচেতন, গতিময়, সৃজনশীল ও কর্মদ্যোমী। সজীব

মস্তিষ্কপ্রসূত আপনার কর্মপরিকল্পনাগুলোও নিশ্চিতভাবেই হয়ে উঠবে তুলনামূলক গোছানো।

গত শতাব্দীর মহান মানবসেবী মাদার তেরেসা তার সমৃদ্ধ জীবন-অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছিলেন, ‘মৌনতার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের আত্মাকেই স্পর্শ করি।’ তাই প্রতিদিনের চর্চায় মৌনতা আপনার নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হলে জীবন থেকে দূর হবে সমস্ত নেতিবাচকতা, হতাশা ও বিষণ্ণতার মতো জীবনঘাতী আবেগের আক্রমণ। জীবন পূর্ণ হয়ে উঠবে ইতিবাচকতা ও প্রত্যয়ে। আপনার আত্মার আনন্দ প্রভাবিত করবে চারপাশের মানুষ ও পরিবেশকেও।

তথ্যসূত্র : হার্ট (অফিসিয়াল জার্নাল অব ব্রিটিশ কার্ডিওভাসকুলার সোসাইটি)

১ এপ্রিল ২০০৬

আপনার সচেতনতার সাথে
সংযোগ স্থাপন করার জন্যে
প্রয়োজন নীরব মুহূর্ত।
প্রতিদিন হাজারো কাজের ফাঁকে
এই নীরব মুহূর্ত
বের করে নিন।

নবজাগরণে
জনপ্রিয় হচ্ছে
যোগ-মেডিটেশন



প্রশান্তির আবেদন সার্বজনীন। এ এক চিরন্তন সত্য। আর এ-যুগে প্রযুক্তির যথেষ্ট ব্যবহার ও অমিতাচারী জীবনযাপন যখন মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে অসহনীয় স্ট্রেস, বিষণ্ণতা আর নানা মনোদৈহিক রোগ-ব্যধির দিকে। ক্রমশ ফিকে হয়ে পড়ছে আমাদের পারিবারিক সামাজিক সম্পর্কগুলো। চিরকাজ্জিক্ত প্রশান্তির প্রয়োজনটা আজ অনুভূত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তাই বিশ্বজুড়ে এখন বাড়ছে মেডিটেশন ও যোগচর্চার জনপ্রিয়তা।

এ-কালের স্বনামখ্যাত স্কটিশ ইতিহাসবিদ, লেখক ও সমালোচক উইলিয়াম ড্যালরিম্পল তার একটি নিবন্ধে (*আন্ডার দি স্পেল অব ইয়োগা*, দি নিউইয়র্ক রিভিউ অব বুকস, ৬ মার্চ ২০১৪) উল্লেখ করেন, বর্তমানে আনুমানিক দুই কোটি আমেরিকান নিয়মিত যোগচর্চা করেন।

পাশ্চাত্যের পাশাপাশি সারা পৃথিবীতেই আধুনিক মানুষের মনোদৈহিক সুস্বাস্থ্য এবং সার্বিক কল্যাণে আত্মসন্ধান ও আত্ম উন্নয়নের এ চর্চাটি পেয়েছে নতুন মাত্রা। সে ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ সম্প্রতি ২১ জুনকে ‘বিশ্ব যোগ দিবস’ ঘোষণা করেছে।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান কী বলে?

যোগচর্চা করে সত্যিই কি কোনো কাজ হয়? আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র কি যোগধ্যানের বৈজ্ঞানিক উপকারিতা সমর্থন করে? এমনি নানা প্রশ্ন পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেই ষাটের দশক থেকে। রোগ নিরাময়ে যোগধ্যানের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করার আগপর্যন্ত তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—সুস্থ হতে হলে গিলতে হবে মুঠো মুঠো ওষুধ কিংবা শরণাপন্ন হতে হবে ছুরি-কাঁচির।

যোগব্যায়ামের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কতটুকু, তা বের করার জন্যে গত ৫০ বছরে বিস্তারিত গবেষণা হয়েছে। ১৯৭৫ সালে সর্বপ্রথম নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিশ্বের প্রভাবশালী মেডিকেল জার্নাল *ল্যানসেট*। তাতে বলা হয়, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে যোগব্যায়াম অত্যন্ত কার্যকরী।

এরপর একে একে *ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল*, *জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন*, *জার্নাল অব আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজি*, *জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল অনকোলজি*-সহ বিশ্বের প্রথমসারির বহু মেডিকেল

জার্নালে যোগধ্যানের কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাস্থ্য গবেষণায় সারাবিশ্বে নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠান আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ যোগব্যায়ামকে বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং যোগ-মেডিটেশনের প্রসারে তারা এ পর্যন্ত বরাদ্দ করেছে প্রায় ১০ কোটি ডলার।

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের একদল গবেষক ১৭ হাজার রোগীর ওপর গবেষণা পরিচালনা করেন। তারা দেখেন, যেসব রোগী ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যোগ-মেডিটেশন চর্চা করেছেন, তাদের চিকিৎসা-ব্যয় কমে গেছে ৪৩ শতাংশ পর্যন্ত। অর্থাৎ যোগচর্চা বছরে জনপ্রতি ২,৩৬০ ডলার বা প্রায় দুই লক্ষ টাকা সাশ্রয় করে।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে পরিচালিত একাধিক গবেষণায় দেখা যায়, যোগ-মেডিটেশন চর্চার ফলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ হয়ে উঠেছে সুতীক্ষ্ণ ও সুসংহত। সেইসাথে স্মৃতিশক্তি, সহনশীলতা ও আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলাফল ভালো হচ্ছে এবং শ্রেণিকক্ষে তাদের আচরণ আগের চেয়ে মার্জিত। শিক্ষার্থীদের রাগ ক্ষোভ স্ট্রেসও কমে গেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, মেডিটেশন মানুষকে সচেতন করে তোলে সার্বিকভাবে। বদলাতে সাহায্য করে মনোদৈহিক অস্তিত্বের গভীর থেকে। এর পাশাপাশি নিয়মিত মেডিটেশনের ফলে আমাদের দেহকোষ ও শারীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ড গভীরভাবে প্রভাবিত হয় এবং রোগ নিরাময়ে এটি পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

এসব নানা কারণে পাশ্চাত্যে ক্রমশ বাড়ছে যোগব্যায়ামের প্রতি আগ্রহ। ২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের দু-কোটি মানুষ নিয়মিত যোগব্যায়াম চর্চা করত।



পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার রংপুরে কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমে অংশ নেন ১,১০৬ জন নারী কনস্টেবল, নভেম্বর ২০১৭। সম্প্রতি এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠ্যবই হিসেবে কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করেছে ফাউন্ডেশন প্রকাশিত রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা বইটিকে।

ইয়োগা জার্নাল প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, পাঁচ বছরের মাথায় যোগব্যায়াম চর্চাকারীর সংখ্যা দেড়গুণ বেড়ে তিন কোটি ৭০ লক্ষতে দাঁড়িয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার সাড়ে ১১ শতাংশ।

যোগ-মেডিটেশন ৯

সুস্থতা ও তারুণ্যের জন্যে

দীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, শরীরকে পেশীবহুল করে নির্দিষ্ট আকৃতি দেয়ার প্রত্যাশায় করা ভারী ব্যায়াম বা অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে যোগচর্চা সুস্থতার জন্যে বেশি কার্যকর। ভারী ও পেশিবহুল শরীর তৈরি করতে গিয়ে আবেগের ভারসাম্যহীনতা, স্বতঃস্ফূর্ততা হ্রাস এবং কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধিসহ নানা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়।

আর যোগচর্চায় পেশী মজবুত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন অঙ্গের স্বতঃস্ফূর্ততা বাড়ে। কোলেস্টেরলের পরিমাণ, ওজন ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে আসে। কারণ যোগচর্চা এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনের পরিমাণ সুষম করে।

১২ মে ২০১৫ ‘নিউরোপ্রোটেক্টিভ ইফেক্টস অব ইয়োগা প্র্যাকটিস’ শিরোনামে একটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয় *ফ্রন্টিয়ার্স ইন হিউম্যান নিউরোসায়েন্স* জার্নালে। এতে বলা হয়, মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা নির্ভর করে গ্রে-ম্যাটারের পরিমাণের ওপর। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মস্তিষ্কে এই গ্রে-ম্যাটারের পরিমাণ কমেতে থাকে। ফলে শারীরিক সমস্ত কার্যক্রমের গতিও কমেতে থাকে। এজন্যেই চল্লিশোর্ধ হওয়ার সাথে সাথে অনেকের খাওয়া, চলাফেরা, স্মৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজে আসে ধীরগতি।

কিন্তু স্নায়ুবিজ্ঞানীরা দেখেছেন, সপ্তাহে যারা চার থেকে ২০ ঘণ্টা করে যোগচর্চা (যোগাসন দমচর্চা মেডিটেশন) করেন, ৫০ বছর বয়সেও তাদের মস্তিষ্কের গ্রে-ম্যাটারের পরিমাণ ২৫ বছর বয়সী যুবকের সমান। অর্থাৎ যোগচর্চাকারীরা ৫০ বছর বয়সেও দৈনন্দিন কাজে ২৫ বছরের যুবকের মতোই স্বতঃস্ফূর্ত।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, ২৫-এর পর যে-কোনো বয়সে যোগচর্চা শুরু করলে আট সপ্তাহের মাথায় এই পরিবর্তন শুরু হয় এবং কয়েক মাসের মধ্যে চর্চাকারীর জীবনে স্থায়ী হয়। তাই সুস্থতা ও দীর্ঘ তারুণ্যের জন্যেই প্রয়োজন যোগ-মেডিটেশন।

আধুনিক মানুষের জীবনচর্চা

হাজার বছর আগে এ অঞ্চলের সাধক-মুনি-ঋষিদের উদ্ভাবিত ‘যোগ’-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ণ হলো ধ্যান বা মেডিটেশন। পৃথিবীর সব প্রধান ধর্মেই গুরুত্বের সাথে মেডিটেশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এটি এখন আর নিছক ধর্মীয় কোনো বিষয় নয়।

মেডিটেশন প্রকৃত অর্থে এখন একটি আধুনিক জীবনচর্চা, যা মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। মানুষকে ধীরস্থির এবং তার মনকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন করে তোলে। আবেগীয় ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে মেডিটেশন। মনোযোগকে করে লক্ষ্যভেদী। হৃদয়ে সৃষ্টি হয় কল্যাণচেতনা, ভালবাসা ও সমর্মিতা।

আমরা বলতে পারি, সবদিক থেকে ভালো থাকার জন্যে মেডিটেশন একটি সহজ উপায়। তাই এর চর্চা হচ্ছে আজ বিশ্বজুড়ে সর্বত্র, এমনকি স্কুল থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত।

দেশে দেশে যোগ-মেডিটেশনের সরকারি স্বীকৃতি

ব্রিটিশ নাগরিকদের ওপর যোগ-মেডিটেশনের সার্বিক উপকারিতা দীর্ঘ একবছর যাবৎ পর্যবেক্ষণ শেষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি দেশব্যাপী যোগ-মেডিটেশন প্রশিক্ষণের জন্যে এক কোটি পাউন্ড বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করে। ২০১১ সালে ব্রিটিশ সরকার যোগ-মেডিটেশনের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।

যোগচর্চাকারীদের জন্যে আনন্দের সংবাদ হলো, ইংল্যান্ডের শিক্ষামন্ত্রী এডওয়ার্ড টিম্পসন সংসদীয় আলোচনায় বলেন, অনলাইন আসক্তি থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করার জন্যে ইংল্যান্ডের স্কুলগুলোতে যোগ-মেডিটেশন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি ও আত্মসী আচরণ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে ইংল্যান্ডের স্কুলগুলো যোগ-মেডিটেশনকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

যোগব্যায়ামের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করে ভারতে ২০১৫-১৬ সালে ঘোষিত বাজেটে যোগ-মেডিটেশনের ওপর পূর্ব-আরোপিত সার্ভিস ট্যাক্স স্থায়ীভাবে প্রত্যাহার করা হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালে রাজ্য সরকারগুলোর প্রতি নির্দেশ জারি করে যেন শিক্ষার্থীদের সুস্থ দেহ ও সতেজ



মার্কিন সেনাবাহিনীর সবচেয়ে অভিজাত ইউনিট নেভি সিল-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ইউএস ট্রেনিং এন্ড ডকট্রিন কমান্ড ২০১১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ-মেডিটেশনকে অন্তর্ভুক্ত করে। উল্লেখ্য, মার্কিন সৈন্যরা ২০০৬ সাল থেকেই যোগধ্যান চর্চা করে আসছে।

মন অর্জনে যোগব্যায়াম চর্চায় আগ্রহী করে তোলা হয়। একই বছর ‘ইয়োগা ট্রেনিং ফর পুলিশ পার্সোনেল’ স্কিমের আওতায় যোগচর্চাকে ভারতীয় পুলিশ সদস্যদের জন্যে বাধ্যতামূলক করা হয়।

আমেরিকার স্কুলগুলোতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণ

২০১৬ সালে আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশন জানায়, আমেরিকায় প্রতি তিন জন শিশুর একজন অতিরিক্ত ওজনের কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাদকাসক্তি ও ধূমপানকে ছাড়িয়ে শিশু-কিশোরদের এক নম্বর সমস্যা এখন এটি।

মেদস্থূলতার প্রতিকার হিসেবে আমেরিকার অনেক স্কুল শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়ে ক্লাস করা এবং অ্যাথলেটিক্সের ওপর জোর দিয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, সব বাচ্চাের জন্যে সারাদিন দাঁড়িয়ে ক্লাস করা ও অ্যাথলেটিক্সের চর্চা করা কঠিন। তাই স্কুলগুলো এখন শিশুদের জন্যে যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে।

বাংলাদেশে জনপ্রিয় হচ্ছে যোগ-মেডিটেশন

১৯৮৩ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র’। মূলত এর মধ্য দিয়েই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মেডিটেশন চর্চার সূত্রপাত ঘটে বাংলাদেশে। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারিতে যোগ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স, যার ফলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্যে সুযোগ ঘটে ব্যাপকভাবে মেডিটেশন চর্চার।

তারপর দীর্ঘ দু-যুগের সাফল্যযাত্রায় একে একে অনুষ্ঠিত হয়েছে কোয়ান্টাম মেথডের সোয়া চারশটিরও বেশি ব্যাচ এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে বিভিন্ন বয়সের অগণিত মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ থেকে লাভ করেন সঠিক জীবনদৃষ্টি। সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখ জীবনের পথে এগিয়ে চলার এ ধারণা ভূমিকা রেখেছে লাখে জীবন বদলের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে।

এভাবেই বাংলাদেশেও ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মেডিটেশন। সচেতন মানুষ মাত্রই বুঝতে শুরু করেন মনোদৈহিক সুস্থতা ও সফল জীবনের জন্যে মেডিটেশনের কার্যকারিতা। দেশের লক্ষ পরিবারে ও বিভিন্ন অফিসে, পার্কে, স্কুল-কলেজসহ নানা প্রতিষ্ঠানে এখন নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করা হয়।

২০১৬ সালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র রাজধানীর পার্কে, জিমেনেসিয়ামে যোগ-মেডিটেশন প্রশিক্ষণের ঘোষণা দেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) ও নির্বাচন কমিশনে কোয়ান্টাম ইয়োগার একাধিক সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

এ-ছাড়াও ২০১৭ সালে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার রংপুরে দুই সহস্রাধিক মহিলা প্রশিক্ষার্থী কনস্টেবল কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রমে অংশ নেন। উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশন প্রকাশিত রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা বইটিকে সম্প্রতি এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠ্যবই হিসেবে নির্বাচিত করেছে রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ। কোয়ান্টামের দু-যুগের সাফল্যযাত্রায় বাংলাদেশের জনজীবনকে স্পর্শ করেছে মেডিটেশনের কল্যাণতরঙ্গ।

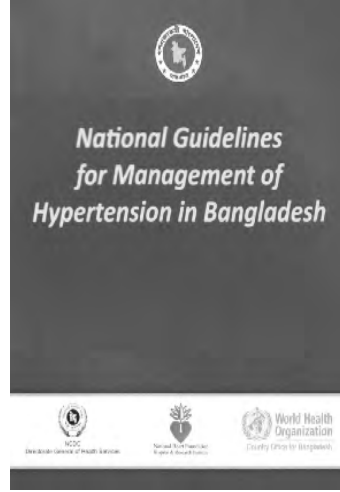
উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে জাতীয় চিকিৎসা নীতিমালা যোগ-মেডিটেশন উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে জাতীয় চিকিৎসা নীতিমালা প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ সরকার। প্রকাশিত হয়েছে (ডিসেম্বর ২০১৩) National Guidelines for Management of Hypertension in Bangladesh. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ-এর যৌথ গবেষণা ও উদ্যোগে প্রণীত এ নীতিমালায় বলা হয়েছে, চিকিৎসকদের উচিত কার্যকরভাবে স্ট্রেসমুক্তি ও শিথিলায়নের জন্যে উচ্চ রক্তচাপের রোগীকে মেডিটেশনে উৎসাহিত করা (পৃষ্ঠা-১৮)।

খ্যাতিমান চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক-গবেষক-বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে পরিচালিত এ গবেষণা কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসা ও এ বিষয়ে জনসচেতনতার পথিকৃৎ জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. আব্দুল মালিক।

এ নীতিমালায় উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে দুই ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, জীবনশৈলী পরিবর্তনের মাধ্যমে; দ্বিতীয়ত, ওষুধের মাধ্যমে। সুস্থ জীবনাচার অনুসরণের লক্ষ্যে সঠিক খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম, ওজন নিয়ন্ত্রণ, তামাক ও মাদক বর্জনের পাশাপাশি স্ট্রেসমুক্তির উপায় হিসেবে মেডিটেশন, যোগব্যায়াম, প্রাণায়ামের (ব্রিডিং এক্সারসাইজ) উপযোগিতার কথা গবেষণার ফলাফলে উল্লেখ করা হয়।

পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, দেহ-মনের শিথিলায়নের মধ্য দিয়ে দেহের সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে।



কোয়ান্টাম প্রকাশিত আরো বই

- ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন
ড. এম শমশের আলী
- ভাঙে দুর্দশার চক্র
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
- রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা
নাহার আল বোখারী
- এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই
হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ (সংকলিত)
- কোয়ান্টাম ভাবনা সাফল্যগাথা ১
(সংকলিত)
- কোয়ান্টাম ভাবনা সাফল্যগাথা ২
(সংকলিত)
- সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন (সংকলিত)

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা:

মাসুম রহমান

প্রচ্ছদের ছবি:

ড্রোন আলোকচিত্র

আরোগ্যশালা, কোয়ান্টামম, লামা, বান্দরবান



আধুনিক মানুষের জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম।
সঠিক জীবনদৃষ্টি প্রয়োগ করে মেধা ও প্রতিভার পরিপূর্ণ
বিকাশের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে অনন্য মানুষে
রূপান্তরিত করাই এর লক্ষ্য।

স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে সৃষ্টির সেবায়
সজ্জবদ্ধভাবে কাজ করে বাংলাদেশকে বিশ্বের নেতৃস্থানীয়
জাতিতে রূপান্তরিত করাই এর মনছবি।

কোয়ান্টাম মেথড অনুশীলন করে সমাজের সর্বস্তরের লাখো
মানুষ অশান্তিকে প্রশান্তিতে, রোগকে সুস্থতায়,
ব্যর্থতাকে সাফল্যে, অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন।
কোয়ান্টাম চর্চার মাধ্যমে আপনিও বদলে দিতে পারেন
আপনার জীবন।

quantummethod.org.bd

ISBN 978-984-34-3745-7